بِسۡمِ اللّٰہِ الرَّحۡمٰنِ الرَّحِیۡمِ نَحۡمَدُہٗ وَنُصَلِّیۡ عَلٰی رَسُوۡلِہِ الۡکَرِیۡمِ وَعَلٰی عَبۡدِہِ الۡمَسِیۡحِ الۡمَوۡعُوۡدِ

সীরাতুন্নাবী সংখ্যা

وَلَقَدۡ نَصَرَکُمُ اللّٰہُ بِبَدۡرٍ وَّاَنۡتُمۡ اَذِلَّۃٌ

বদর

সাপ্তাহিক কাদিয়ান

Weekly BADAR Qadian Bangla

সংখ্যা
39-40

বার্ষিক গ্রাহক চাঁদা
৫৭৫ টাকা

বর্ষ – ৬

সম্পাদক:
তাহের আহমদ
মুনির

Postal Reg. No. GDP/ 43 /2020 -2022 ❍ 30 শে সেপ্টেম্বর-7 ই অক্টোবর, 2021 ❍ 22-29- সফর, 1443, হিজরী কামরী

মসজিদ নববী

সমগ্র নবুয়্যতের ধারার মধ্যে সর্বোচ্চ মর্যাদার সাহসী নবী

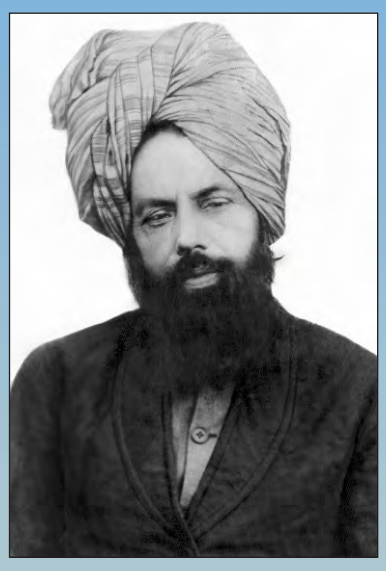

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন–

"যখন আমরা ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখি, তখন আমরা সমগ্র নবুয়্যতের ধারার মধ্যে মাত্র এমন একজনকেই দেখতে পাই যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার সাহসী নবী, জীবন্ত নবী এবং খোদা তা'লার অত্যুচ্চ মর্যাদার প্রিয় নবী, এবং যিনি নবীগণের নেতা, রসুলগণের গৌরব এবং সকল প্রেরিত পুরুষগণের মাথার মুকুট, এবং তাঁর নাম মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর ছায়ার মধ্যে দশ দিন চলতে পারলেই সেই আলো লাভ করা যায়, যা ইতিপূর্বে হাজার বছরেও লাভ করা সম্ভব হত না।"

(সিরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড–১২, পৃ: ৮২)

খোদা তা'লা যাঁকে মহান বলে অভিহিত করেছেন, তিনিই কতই না মহান!

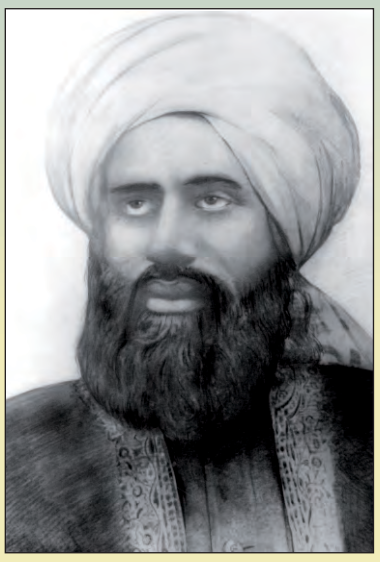

হযরত খলীফাতুল মসীহ আওয়াল (রা.) বলেন-

"রসুলুল্লাহ্ কোন্ পদপর্যাদার মানুষ ছিলেন? তাঁর পদমর্যাদা জানতে হলে এই আয়াতগুলি দৃষ্টিপটে রাখা উচিত।

১) إِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ (1) (আল কলম: ৫) দ্বিতীয় আয়াতে বলা হয়েছে- وَكَانَ فَضْلُ اللهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (আন নিসা: ১১৪)। আল্লাহ্ তা'লা হযরত মহম্মদ রসুলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যকে মহান হিসেবে অভিহিত করেছেন আর তাঁর উপর যে কৃপা বর্ষিত হয়েছে সেটিকেও তিনি মহান আখ্যায়িত করেছেন। চিন্তা করে দেখ, খোদা তা'লা যাঁকে মহান বলে অভিহিত করেছেন, তিনিই কতই না মহান! কাজেই আমাদের এমন মহান মর্যাদার রসুলকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে নেতা হিসেবে গ্রহণ করার আকাঙ্খাই বা কিভাবে মনে জাগে?"

(খুতবাতে নূর, পৃ: ৪৬৪)

সে আমার মন ও প্রাণ, আমার অভীষ্ট।

হযরত খলীফাতুল মসীহ সানি (রা.) বলেন–

"মুহাম্মদ (সা.)–এর ভালবাসা কিভাবে আমার মজ্জাগত হয়ে গিয়েছে, সে খবর তারা কিভাবে জানবে? তিনিই আমার মন ও প্রাণ, তিনিই আমার অভীষ্ট; তাঁর দাসত্ব আমার জন্য সম্মান ও গর্বের, তাঁর তুচ্ছ দাস হয়ে থাকা আমার নিকট রাজ সিংহাসনের চেয়েও অধিক মূল্য রাখে। তাঁর গৃহে ঝাড়ুদারের কাজের তুলনায় সমগ্র জগতের রাজত্বও তুচ্ছ। তিনি খোদার প্রিয়ভাজন, আমি তাঁকে কেনই বা ভালবাসব না? তিনি আল্লাহ্ তা'লার নৈকট্যভাজন অথচ আমি কেন তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ করব না?"

(আনওয়ারুল উলুম, ২য় খণ্ড, পৃ: ৫০৩)

সূচীপত্র

বিষয়	পৃষ্ঠা
সম্পাদকীয়	১
কুরআনের আলোকে মহানবী (সা.)এর মর্যাদা	২
উম্মতের প্রতি মহানবী (সা.)-এর মূল্যবান উপদেশাবলী	৩
হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী	৪
সীরাতুন্নাবী (সা.) উপলক্ষ্যে হুযুর আনোয়ার (আই.)-এর ভাষণ	৫
একত্ববাদ সম্পর্কে মহানবী (সা.) এর শিক্ষা	৯
মহানবী (সা.) একজন দক্ষ মনস্তত্ত্ববিদ	১১
মহানবী (সা.) এর অতুলনীয় ক্ষমাপরায়ণতা	১৩

لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ

হযরত মসীহ মওউদ (আ)-এর পুরস্কার সম্বলিত চ্যালেঞ্জ

আমি প্রত্যেক বিরুদ্ধবাদীকে প্রতিদ্বন্দ্বিতার জন্য আহ্বান করেছি

إِنَّ السُّمُوْمَ لَشَرُّ مَا فِي الْعَالَمِ ۞ شَرُّ السُّمُوْمِ عَدَاوَةُ الصُّلَحَاءِ

রোমান বাদশাহ বলেছিল, 'যদি সেই মহান ব্যক্তির কাছে পৌঁছতে পারতাম, তবে তাঁর পা ধুয়ে দিতাম'। যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে হযরত মসীহ (আ.) সম্পর্কে সমসাময়িক যুগের কোন ছোট জমিদারও এমন কথা বলেছে, যা রোমান সম্রাট আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে বলেছিল যা এ যাবৎ ইতিহাস ও সহীহ হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে, তবে আমি আপনাকে এখনই এক হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দিব।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর এই গৌরবময় চ্যালেঞ্জটি আমরা তাঁর রচনা নুরুল কুরআন সংখ্যা-২ , রূহানী খাযায়েনের ৯ম খণ্ড থেকে উপস্থাপন করছি। হযরত মসীহ মওউদ (আ.) কুরআন মজীদের পরম উৎকর্ষ তুলে ধরার উদ্দেশ্যে 'নুরুল কুরআন' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেছিলেন, কিন্তু নিদারুন ব্যস্ততার কারণে তার মাত্র দুটি সংখ্যাই প্রকাশিত হতে পেরেছিল। দ্বিতীয় নম্বর, অর্থাৎ নুরুল কুরআন নম্বর-২- এ তিনি গুরদাসপুর জেলার ফতেহগড় নিবাসি পাদ্রী ফতেহ মসীহর সেই সব আপত্তির উত্তর দিয়েছেন যা সে হযরত মহম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর পবিত্র সহধর্মিণীদের উপর করেছিল। এখানে আমি পাদ্রী ফতেহ মসীহ্‌র সেই সব আপত্তি এবং সেগুলির উত্তর উপস্থাপন করছি। যার জন্য হযরত মসীহ মওউদ (আ.) ফতেহ মসীহকে এক হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়ার চ্যালেঞ্জ জানিয়েছিলেন। পাদ্রী ফতেহ মসীহ উম্মুল মোমেনীন হযরত আয়েশা (রা.)-এর সঙ্গে আঁ হযরত (সা.)-এর বিবাহের বিষয়ে এই আপত্তি করেছিল যে তিনি (সা.) ৯ বছরের আয়েশাকে বিবাহ করেছেন যা শরিয়তের পরিপন্থী। অতএব, এটি বিবাহ নয়, ব্যাভিচার। এই বিবাহ যদি শরিয়ত পরিপন্থী ছিল, সেক্ষেত্রে পাদ্রী সাহেবকে কুরআন থেকে না হলেও অন্তত পক্ষে তওরাত বা ইঞ্জিল থেকে এর কোন প্রমাণ দিতে হত, যাতে বোঝা যেত যে ৯ বছরের মেয়ের সঙ্গে বিয়ে করা সত্যিই শরিয়ত পরিপন্থী কি না। কিন্তু পাদ্রী সাহেব কোন ঐশী গ্রন্থ থেকে প্রমাণ দেন নি, তিনি ইংরেজ সরকারের উদ্ধৃতি দিয়ে বলেছেন, ইংরেজ সরকারে বিবাহের বয়স আঠারো বছর। ইংরেজ সরকারের উদ্ধৃতি দিয়ে পাদ্রী সাহেব প্রশ্ন করেছেন যে আঁ হযরত (সা.) যদি ইংরেজদের শাসন ব্যবস্থায় থাকতেন, তবে সরকার তাঁর প্রতি কি আচরণ করত?

পাদ্রী ফতেহ মসীহর দ্বিরাচিতার নমুনা এখানে স্পষ্ট। একটি কর্মকে শরিয়ত পরিপন্থী বলার পর তার প্রমাণ ঐশী গ্রন্থ থেকে না দিয়ে, ইংরেজ সরকারের উদ্ধৃতি দেয়। এই পাদ্রীরা এতটাই উদ্ধত হয় যে, সব থেকে বেশি পবিত্র , কোটি কোটি মানুষের নেতা ও পথপ্রদর্শক-এর উপরও এমন জঘন্য অপবাদ আরোপ করতে বিন্দুমাত্র কুণ্ঠিত হয় না, নির্লজ্জতার সকল সীমা ছাড়িয়ে যায়। কি কারণে তাদের দ্বারা এতটা ঔদ্ধত্য প্রকাশ পায়? এ সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর কিছু উদ্ধৃতি তুলে ধরছি। তিনি বলেন-

"স্মরণ থাকে যে, বস্তুত পাদ্রীরা, অপরকে হেয় প্রতিপন্ন করতে এবং গালমন্দ করতে এদের জুড়ি নেই। আমার কাছে এমন সব পাদ্রীদের বই-পুস্তকের ভান্ডার আছে, যারা শত সহস্র গালমন্দ দ্বারা সেগুলি পূর্ণ করেছে।

(নূরুল কুরআন নং-২, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড, পৃ: ৩৭৫)

পাদ্রী সাহেবগণ বিশেষ করে কুরআন করীম এবং আঁ হযরত (সা.) এর উপর হিংস্র পশুর ন্যায় আক্রমণ করে। এ বিষয়ের উপর আলোকপাত করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

"বস্তুত সত্য কথা এই, খ্রিষ্টানগণ কুরআনের ওপর বড়ই বিরক্ত ও অসন্তুষ্ট। তাদের বিরাগ ও অসন্তোষের কারণ, এ কুরআন খ্রিষ্টধর্মের যাবতীয় ডানা ও পালক ছিঁড়ে ফেলেছে। কোন মানবের পক্ষে স্বয়ং খোদা হওয়া যে সম্পূর্ণ অলীক ও অসম্ভব, তা স্পষ্টরূপে দেখিয়ে দিয়েছে। খ্রিষ্টানদের ক্রুশ সম্বন্ধীয় বিশ্বাসগুলোকে সম্পূর্ণরূপে খণ্ডন করেছে। ইঞ্জিলের যে নৈতিক শিক্ষা নিয়ে খ্রিষ্টানগণ এত গর্ব করতেন তা এককভাবেই অসম্পূর্ণ ও অচল বলে প্রতিপন্ন করেছে। কাজেই খ্রিষ্টানেরা তাদের স্বার্থহানি দেখে ক্ষেপে উঠেছে এবং অসংখ্য মিথ্যা কথা বলছে।"

(চাশমায়ে মসীহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড, ২০, পৃ: ৩৪৩)

তিনি আরও বলেন-

পাদ্রীদের বুকে ইসলাম এক জগদ্দল পাথর হয়ে বসে আছে, অন্যথায় তাদের কাছে অন্যান্য সকল ধর্ম কপর্দকশূন্য। হিন্দুরাও খৃষ্টধর্মে দীক্ষিত হয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরেছে। রামচন্দ্র ও ঠাকুরদাস ইসলামকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করতে নিজেদের সর্বশক্তি প্রয়োগ করে পুস্তক রচনা করেছে। বস্তুত, ইসলামের দ্বারাই যে তাদের বিলোপ ঘটবে তা তারা আঁচ করতে পেরেছে। স্বাভাবিকভাবেই যার মাধ্যমে মৃত্যু ঘটে তার সম্পর্কেই ভীতি বিরাজ করে। মুরগী ছানা বিড়াল দেখে চেঁচাতে থাকে। ঠিক তেমনি বিভিন্ন ধর্মের অনুসারীরা, আর বিশেষকরে পাদ্রীরা ইসলামকে প্রতিহত করতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে। কারণ, তাদের বিশ্বাস-এমনকি তাদের অন্তরাত্মা তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছে যে, ইসলামই একমাত্র ধর্ম যা মিথ্যা ধর্মসমূহকে পিষে ফেলবে।'

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১০)

সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

"আমি আশ্চর্য হই যে, এরা নিজেকে শিক্ষিত বলে পরিচয় দেয়, সভ্য মানুষ হিসেবে দাবি করে। অথচ কোটি কোটি মানুষের পথপ্রদর্শকদের উপর আনুমানিক কথার উপর ভিত্তি করে আক্রমণ করে। অথচ এদের নিজেদের নৈতিকতা এতটা নিম্নমানের যে, মানবতা তাদের দেখে লজ্জিত হয়। তাদের দুঃসাহসের একমাত্র কারণ হল, বর্তমানে খৃষ্টানরা শাসনক্ষমতা দখল করে আছে। তারা এ নিয়েও লজ্জিত নয় যে, যখন মুসলমানেরা পৃথিবীতে রাজত্ব করত, আর খৃষ্টানদের অবস্থা এখনকার মুসলমানদের থেকেও করুণ ছিল, তখনও মুসলমানেরা মসীহ নাসেরী সম্পর্কে কখনও কোন অপ্রিয় ভাষা প্রয়োগ করেনি। মুসলমানেরা এক হাজার বছর পর্যন্ত খৃষ্টান দেশসমূহে রাজত্ব করার সময় তাদের নেতা ও পথপ্রদর্শকের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করেছে, সেই সদাচারের কথা স্মরণ করে খৃষ্টানরা দুই-তিনশ বছরের রাজত্বের কারণে যদি এমন উদ্ধত হয়ে না উঠত আর নবীকুলের সর্দারের উপর এমন পশুসুলভ আক্রমণ না করত! মুসলমানেরা যীশু মসীহর বিরুদ্ধে কখনও আক্রমণাত্মক পদক্ষেপ নেয় নি, নচেৎ সত্য এই যে মুসলমানেরা তাঁর সম্পর্কে অনেক বেশি কথা বলতে পারে যা খৃষ্টানরা আঁ হযরত (সা.)-এর বিরুদ্ধে বলে থাকে- মুসলমানদের এই অনুগ্রহের কথা একটু যদি তারা ভেবে দেখত!"

(তফসীরে কবীর, ১ম খণ্ড,পৃ: ২৫৩)

হযরত আয়েশা (রা.)-এর বিবাহ ৯ বছর বয়সে হওয়া সংক্রান্ত

এরপর ১৯-এর পাতায়.....

নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিশতাগণও (তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে)। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।

কুরআনের আলোকে মহানবী (সা.)এর মর্যাদা

وَمَنْ يُّطِعِ اللّٰهَ وَالرَّسُوْلَ فَاُولٰٓئِكَ مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ مِّنَ النَّبِيّٖنَ وَالصِّدِّيْقِيْنَ وَالشُّهَدَآءِ وَالصّٰلِحِيْنَ ۚ وَحَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا ○

অনুবাদ: এবং যাহারা আল্লাহ্ এবং এই রসুলের আনুগত্য করিবে তাহারা ঐ সকল লোকদের মধ্যে শামিল হইবে যাহাদিগকে আল্লাহ্ পুরস্কার দান করিয়াছেন অর্থাৎ নবীগণ এবং সিদ্দীকগণ এবং শহীদগণ এবং সালেহগণের মধ্যে। এবং ইহারাই সঙ্গী হিসাবে উত্তম।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

এই আয়াতে মনোযোগ আকর্ষণ করার মত একাধিক বিষয় রয়েছে। প্রথম, 'আর রসুল' বলতে আঁ হযরত (সা.)কে বোঝানো হয়েছে। অর্থাৎ এই বিশেষ রসুল।

দ্বিতীয়, যদি তোমরা এই রসুলের আনুগত্য কর, তবে সেই সব লোকদের অন্তর্ভুক্ত হবে যাদের মধ্যে রয়েছেন নবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সালেহগণ। এর অর্থ, আঁ হযরত (সা.)-এর আঁ হযরত (সা.)-এর অনুগমণে নবীও আসতে পারে। অর্থাৎ- যে এই রসুলের আনুগত্য করবে।

এখানে অনেক উলেমা দ্বারা জোর করে 'মাআ'-র অর্থ অর্থ করা হয় যে তারা সেই সব লোকেদের সঙ্গে থাকবে, কিন্তু তাদের মধ্য থেকে হবে না। এর সমর্থনে তারা বলে, حَسُنَ اُولٰٓئِكَ رَفِيْقًا বলা হয়েছে, তারা সর্বোৎকৃষ্ট সঙ্গী হবে। অর্থাৎ তারা নবীদের সঙ্গে থাকবে কিন্তু নিজেরা নবী হবে না। এই আয়াতের এমন অনুবাদ আঁ হযরত (সা.)-এর ঘোর অবমাননা করা। কেননা এক্ষেত্রে এই আয়াতের অর্থ এমন দাঁড়াবে 'আঁ হযরত (সা.)-এর আনুগত্যকারীরা নবীদের সঙ্গে থাকবে কিন্তু নিজেরা নবী হবে না। তারা সিদ্দীকদের সঙ্গে থাকবে কিন্তু নিজেরা সিদ্দিক হবে না। তারা শহীদদের সঙ্গে থাকবে কিন্তু নিজেরা শহীদ হবে না। তারা সালেহদের সঙ্গে থাকবে, কিন্তু নিজেরা সালেহ হবে না। কুরআন করীমের একাধিক আয়াতে 'মাআ' (সঙ্গে) শব্দের অর্থ 'মিন' (থেকে) - হিসেবে করা হয়েছে। আলে ইমরানের ১৯৪ নং আয়াত, নিসার ১৪৭ নং আয়াত এবং হিজরের ৩২ নং আয়াত দ্রষ্টব্য। এছাড়া এখানে مَعَ الَّذِيْنَ اَنْعَمَ اللّٰهُ عَلَيْهِمْ- এর পর বলা হয়েছে। এই মিনকে 'বায়ানিয়াহ' বলা হয়, যার দ্বারা বোঝানো হয় যে তাদের সঙ্গে অর্থাৎ তাদের মধ্য থেকে।

আঁ হযরত (সা.)-এর অনুগমন ঐশী ভালবাসা অর্জনের কারণ হয়।

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ ۗ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ ○ (ال عمران:32)

অনুবাদ: তুমি বল, 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস, তাহা হইলে তোমার আমার অনুসরণ কর; আল্লাহও তোমাদিগকে ভালবাসিবেন এবং তিনি তোমাদিগকে তোমাদের সকল অপরাধ ক্ষমা করিয়া দিবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, পরম দয়াময়।'

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَابْتَغُوْٓا اِلَيْهِ الْوَسِيْلَةَ وَجَاهِدُوْا فِيْ سَبِيْلِهٖ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ○ (المائدہ:36)

অনুবাদ:হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! আল্লাহ্র তাকওয়া অবলম্বন কর এবং তাঁহার নৈকট্য লাভের উপায় অন্বেষণ কর এবং তাঁহার পথে জিহাদ কর, যাহাতে তোমরা সফলকাম হও।

(আল মায়েদা: ৩৬)

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন-

আল্লাহ্ তা'লার দিকে 'ওসীলা' অবলম্বন করার যে আদেশ আছে তার দ্বারা রসুলুল্লাহ্ (সা.)কে বোঝানো হয়েছে। এখন আর আল্লাহ্ তা'লার সঙ্গে সরাসরি কোন সম্পর্ক করা যাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর 'ওসীলা' অবলম্বন না করা হয়। আযানের পরের দোয়ার দোয়াও এর বিষয়েরই সমর্থন করে, যেখানে ওসীলার উল্লেখ আছে।

আঁ হযরত (সা.)-এর সত্তা জাতির জন্য রক্ষা কবজ।

وَمَا كَانَ اللّٰهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَاَنْتَ فِيْهِمْ ۚ وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُوْنَ ○

অনুবাদ: এবং আল্লাহ্ এমন নহেন যে, তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন এমতাবস্থায় যে, তুমি তাহাদের মধ্যে রহিয়াছ এবং আল্লাহ্ এমনও নহেন যে, যখন তাহারা ক্ষমা প্রার্থনা করে তখন তিনি তাহাদিগকে আযাব দিবেন। (আনফাল: ৩৪)

আঁ হযরত (সা.)-এর মৃতদেরকে জীবিত করার অর্থ

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اسْتَجِيْبُوْا لِلّٰهِ وَلِلرَّسُوْلِ اِذَا دَعَاكُمْ لِمَا يُحْيِيْكُمْ ۚ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ يَحُوْلُ بَيْنَ الْمَرْءِ وَقَلْبِهٖ وَاَنَّهٗٓ اِلَيْهِ تُحْشَرُوْنَ ○ (انفال:25)

অনুবাদ: হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরা সাড়া দাও আল্লাহ্ এবং তাঁর রসুলের ডাকে, যখন সে তোমাদিগকে ডাক দেয় যেন সে তোমাদিগকে জীবিত করিতে পারে; এবং জানিয়া রাখ,নিশ্চয় আল্লাহ্ মানুষ ও তাহার হৃদয়ের মাঝখানে আসিয়া উপস্থিত হন এবং তাঁহারই নিকট তোমাদের সকলকে একত্রিত করা হইবে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ) এই আয়াতের ব্যাখ্যায় বলেন,

'এই আয়াতে মৃতদের জীবিত হওয়ার স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেওয়া হয়েছে। হযরত ঈসা (আ.)-এর মৃতদের জীবিত করার বিষয়টি নিয়ে খৃষ্টানদের মধ্যে বিভ্রান্তি জন্ম নিয়েছে, তাদের ধারণা, তিনি আক্ষরিক অর্থেই মৃতদের জীবিত করতেন। কাজেই আঁ হযরত (সা.) যেখানে আধ্যাত্মিকভাবে মৃতদেরকে জীবিত করার জন্য আহ্বান করেছেন, তা দ্বারা একথা স্পষ্ট হয়ে যায় যে সেই মৃতরা কবরে শায়িত ছিল না, তারা ছিল আরবের সেই সব মানুষ যারা আধ্যাত্মিকভাবে মৃত ছিল।

আল্লাহ্ এবং ফিরিশতরা আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণ করার মাধ্যমে মোমেনীনদের জামাতকে তাঁর প্রতি দরুদ ও সালাম প্রেরণের নির্দেশ দিয়েছেন।

اِنَّ اللّٰهَ وَمَلٰٓئِكَتَهٗ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ ۭ يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا

অনুবাদ: নিশ্চয় আল্লাহ্ এই নবীর উপর রহমত নাযেল করিতেছেন এবং তাঁহার ফিরিশতাগণও (তাহার জন্য রহমত কামনা করিতেছে)। হে যাহারা ঈমান আনিয়াছ! তোমরাও তাহার জন্য রহমত কামনা (দরূদ পাঠ) কর এবং পূর্ণ শান্তি কামনা কর।

(আল আহযাব: ৫৭)

হযরত আকদস মসীহ মওউদ (আ.) এই আয়াতটি সম্পর্কে বলেন-

' রসুল আকরম (সা.)-এর পুণ্যকর্ম এমন ছিল যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রশংসাকে কোন বিশেষ শব্দের বন্ধনে আবদ্ধ করেন নি। এই আয়াত থেকে এটিই প্রতীয়মান হয়। প্রশংসার জন্য শব্দ নিশ্চয় ছিল, কিন্তু তিনি নিজে তা ব্যবহার করেন নি। অর্থাৎ তাঁর পুণ্যকর্মের প্রশংসাকে সীমাবদ্ধ করা যায় না। এই ধরণের আয়াত অন্য কোন নবীর পদমর্যাদা বোঝাতে ব্যবহার করেন নি। তাঁর অন্তরে সে সততা ও বিশ্বস্ততা ছিল, তাঁর পুণ্যগুলি খোদার দৃষ্টিতে এতটাই পছন্দনীয় ছিল যে খোদা তা'লা মানুষকে কৃতজ্ঞতাস্বরূপ তাঁর প্রতি চিরকাল দরুদ প্রেরণের আদেশ দিলেন।" (মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ৩২)

উম্মতের প্রতি আঁ হযরত (সা.)-এর মূল্যবান উপদেশাবলী

۞ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِنَّمَا یُبْعَثُ النَّاسُ عَلٰی نِیَّاتِهِمْ ۔ (ابن ماجہ، ابواب الزھد باب النیۃ)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, মানুষের কিয়ামত তাদের নিয়ত অনুসারে সংঘটিত হবে। (অর্থাৎ নিজ নিজ নিয়্যত অনুসারে তারা প্রতিদান পাবে)

(সহী বুখারী, কিতাবুত তওহীদ)

۞ عَنْ جَرِیْرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ کُنَّا جُلُوْسًا عِنْدَ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ اِذَا نَظَرَ اِلَی الْقَمَرِ لَیْلَةَ الْبَدْرِ فَقَالَ اِنَّکُمْ سَتَرَوْنَ رَبَّکُمْ کَمَا تَرَوْنَ هٰذَا الْقَمَرَ لَا تُضَامُّوْنَ فِیْ رُؤْیَتِهٖ فَاِنِ اسْتَطَعْتُمْ اَلَّا تُغْلَبُوْا عَلٰی صَلٰوةٍ قَبْلَ طُلُوْعِ الشَّمْسِ وَصَلٰوةٍ قَبْلَ غُرُوْبِ الشَّمْسِ فَافْعَلُوْا ۔

হযরত হারীর বিন আব্দুল্লাহ্ বর্ণনা করেন, ‘ একদিনে রাতে আমরা আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি (সা.) পূর্ণিমার চাঁদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, তোমরা তোমাদের পরওরদিগারকে এভাবেই বিনা বাধায় দেখবে, যেভাবে পূর্ণিমার চাঁদ দেখছ। তোমরা যদি এই সম্মান লাভের চেষ্টা করতে চাও, তবে ফজর ও আসরের নামায যথাসময়ে পড়ার ক্ষেত্রে অবহেলা করো না।

(বুখারী, কিতাবুত তওহীদ)

۞ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ مَنْ لَا یَشْکُرِ النَّاسَ لَا یَشْکُرِ اللهَ۔

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না, সে খোদার কাছেও কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে না। অর্থাৎ কোন ব্যক্তির অনুগ্রহে কারো যদি কোন উপকার লাভ হয়, তবে সেক্ষেত্রে আল্লাহ্ তা’লার প্রতি কৃতজ্ঞতা স্বীকারের পাশাপাশি সেই উপকারী ব্যক্তির প্রতিও কৃতজ্ঞতা জানানো আবশ্যক।

(তিরমিযি, বাবু মা জাআ ফিশশুকরি লিমান আহসানা ইলাইকা)

۞ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ النَّبِیُّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ کُلُّ اَمْرٍ ذِیْ بَالٍ لَا یُبْدَاُ فِیْهِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ فَهُوَ اَقْطَعُ

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, প্রত্যেক সেই কাজ যা বিসমিল্লাহ্ ছাড়া আরম্ভ করা হয়, তা অসম্পূর্ণও বরকতশূন্য হয়ে থাকে। (আল জামিউস সাগীর লিসসুয়ুতি)

۞ عَنْ اَبِیْ مُوْسَی الْاَشْعَرِیِّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَثَلُ الَّذِیْ یَذْکُرُ رَبَّهٗ وَالَّذِیْ لَا یَذْکُرُهٗ مَثَلُ الْحَیِّ وَالْمَیِّتِ۔ وَرَوَاهُ مُسْلِمٌ فَقَالَ مَثَلُ الْبَیْتِ الَّذِیْ یُذْکَرُ اللهُ فِیْهِ وَالْبَیْتِ الَّذِیْ لَا یُذْکَرُ اللهُ فِیْهِ مَثَلُ الْحَیِّ وَالْمَیِّتِ۔ (بخاری، کتاب الدعوات، باب فضل ذکر اللہ تعالیٰ)

হযরত আবু মূসা আশআরী বর্ণনা করেন যে আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, ‘ তাদের উপমা জীবিতের ন্যায় যারা খোদার তা’লার যিকর করে, আর যারা খোদা তা’লার যিকর করে না তাদের উপমা মৃতের ন্যায়।’

মুসলিমে বর্ণিত আছে যে, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন- সেই গৃহের উপমা জীবিতের ন্যায় যেখানে খোদা তা’লার যিকর হয়, আর যে গৃহে খোদা তা’লার যিকর হয় না তার উপমা মৃতের ন্যায়।

(বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত, ফাযলু যিকরে ইলাহি)

۞ سَمِعْتُ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ یَقُوْلُ: اَفْضَلُ الذِّکْرِ : لَآ اِلٰهَ اِلَّا اللهُ وَاَفْضَلُ الدُّعَاءِ : اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ ۔ (ترمذی، کتاب الدعوات، باب دعوۃ المسلم مستجابۃ)

হযরত জাবির (রা.) বর্ণনা করেন, ‘আমি আঁ হযরত (সা.) কে একথা বলতে শুনেছি যে, সর্বোত্তম ‘যিকর’ (আল্লাহ্র স্মরণ) হল কলেমায়ে তওহীদ। অর্থাৎ এ বিষয়ের স্বীকারুক্তি দেওয়া যে, আল্লাহ্ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর সর্বোত্তম দোয়া হল আলহামদোলিল্লাহ।

(তিরমিযি কিতাবুদ দাওয়াত)

۞ قَالَ لِیْ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : اَلَا اَدُلُّكَ عَلٰی کَنْزٍ مِنْ کُنُوْزِ الْجَنَّةِ ؟ فَقُلْتُ بَلٰی یَا رَسُوْلَ اللهِ ! قَالَ : لَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ اِلَّا بِاللهِ۔

হযরত আবু মুসা আশআরী (রা.) বর্ণনা করেন যে, আঁ হযরত (সা.)বলেছেন, ‘আমি কি তোমাদেরকে জান্নাতের ধনভাণ্ডার সমূহের মধ্য থেকে একটি ধনভাণ্ডারের কথা জানাব না?’ আমি নিবেদন করলাম, ‘হে আল্লাহ্র রসুল! আমাকে অবশ্যই বলুন।’ তিনি বললেন, ‘লা-হাওলা পাঠ করবে’। অর্থাৎ আল্লাহ্ তা’লার সাহায্য ব্যাতিরেকে না আছে আমার অসৎ কর্ম থেকে দূরে থাকার শক্তি, আর না আছে পুণ্যকর্ম করার সামর্থ।

(বুখারী, কিতাবুদ দাওয়াত)

۞ عَنْ سَلْمَانَ الْفَارِسِیِّ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ عَنِ النَّبِیِّ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: اِنَّ اللهَ حَیِیٌّ کَرِیْمٌ یَسْتَحْیِیْ اِذَا رَفَعَ الرَّجُلُ اِلَیْهِ یَدَیْهِ اَنْ یَّرُدَّهُمَا صِفْرًا خَائِبَتَیْنِ۔ (ترمذی، کتاب الدعوات)

হযরত সালমান ফারসী (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, ‘আল্লাহ্ তা’লা অতীব লজ্জাশীল, দয়ালু ও কৃপালু। মানুষ যখন তাঁর দরবারে নিজের দুই হাত উপরে তোলে, তখন তিনি তাকে শূন্যহাতে ও বিফলে ফিরিয়ে দিতে লজ্জা পান। অর্থাৎ সত্য অন্তকরণে চাওয়া দোয়াকে তিনি প্রত্যাখ্যান করেন না, তা গ্রহণ করেন।

(তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত)

۞ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ قَالَ : قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ سَرَّهٗ اَنْ یَّسْتَجِیْبَ اللهُ لَهٗ عِنْدَ الشَّدَائِدِ وَالْکُرَبِ فَلْیُکْثِرِ الدُّعَاءَ فِی الرَّخَاءِ ۔ (ترمذی، ابواب الدعوات، باب دعوۃ المسلم مستجابۃ)

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি বাসনা করে যে আল্লাহ্ কষ্টের সময় তার দোয়া গ্রহণ করুক, তার উচিত সুখ-স্বাচ্ছন্দের সময় প্রচুর দোয়া করা।

(তিরমিযি, আবওয়াবুদ দাওয়াত)

۞ عَنْ اَبِیْ هُرَیْرَةَ رَضِیَ اللهُ عَنْهُ اَنَّ رَسُوْلَ اللهِ صَلَّی اللهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ اَحَدٍ یُسَلِّمُ عَلَیَّ اِلَّا رَدَّ اللهُ عَلَیَّ رُوْحِیْ اَرُدُّ عَلَیْهِ السَّلَامَ ۔

হযরত আবু হুরাইরা (রা.) বর্ণনা করেন, আঁ হযরত (সা.) বলেছেন, যে ব্যক্তি আমার প্রতি সালাম প্রেরণ করবে, তার উত্তর দেওয়ার জন্য আল্লাহ্ আমার আত্মাকে ফিরিয়ে দিবেন যাতে আমি তার সালামের উত্তর দিতে পারি।

[অর্থাৎ আঁ হযরত (সা.) এর প্রতি সালাম প্রেরণকারী এমন পুণ্য ও প্রতিদান লাভ করবে, যেন স্বয়ং হুযুর (সা.) সালাম ও দরুদের উত্তর দিবেন।]

আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বাণী

সৈয়্যদানা ও মৌলানা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 'খাতামান্নবীঈন ও খাইরুল মুরসালীন।'

'আমাদের ধর্ম বিশ্বাসের সারমর্ম হল لَا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللّٰهِ । ইহজগতে আমাদের যে ধর্মবিশ্বাস, খোদার কৃপায় যে ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আমরা এই নশ্বর পৃথিবী থেকে বিদায় নিব, তা হল হযরত সৈয়্যদানা ও মৌলানা মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন 'খাতামান্নবীঈন ও খাইরুল মুরসালীন।'

(ইযালায়ে আওহাম, রূহানী খাযায়েন, ৩য় খণ্ড, পৃ: ১৬৯)

সর্বোচ্চ মর্যাদার সাহসী নবী, জীবন্ত নবী এবং খোদা তা'লার অত্যুচ্চ মর্যাদার প্রিয় নবী

'যখন আমরা ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখি, তখন আমরা নবুয়্যতের সারাটা শিক্ষাদিক্ষার মধ্যে মাত্র এমন একজনকেই দেখতে পাই যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার সাহসী নবী, জীবন্ত নবী এবং খোদা তা'লার অত্যুচ্চ মর্যাদার প্রিয় নবী, এবং যিনি নবীগণের নেতা, রসুলগণের গৌরব এবং সকল প্রেরিত পুরুষগণের মাথার মুকুট, এবং তাঁর নাম মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর ছায়ার মধ্যে দশ দিন চলতে পারলেই সেই আলো লাভ করা যায়, যা ইতিপূর্বে হাজার বছরেও লাভ করা সম্ভব হত না।'(সিরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ৮২)

চিরন্তন আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী এবং গৌরব ও পবিত্রতার সিংহাসনে সমাসীন নবী

'হে পৃথিবীর সকল অধিবাসীবৃন্দ! হে প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের সকল মানবত্মাবৃন্দ! আমি সম্পূর্ণ জোরের সঙ্গে তোমাদের সামনে এই ঘোষণা দিচ্ছি যে, এখন পৃথিবীর বুকে একমত্র সত্য ধর্ম হচ্ছে ইসলাম, এবং সত্য খোদাও সেই খোদা যার বর্ণনা দিয়েছে কুরআন, এবং চিরন্তন আধ্যাত্মিক জীবনের অধিকারী এবং গৌরব ও পবিত্রতার সিংহাসনে সমাসীন নবী হলেন হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম, যাঁর আধ্যাত্মিক জীবন ও পবিত্র গৌরবের এই প্রমাণ আমি পেয়েছি যে, তাঁর আনুগত্য ও ভালবাসায় আমরা রুহুল কুদ্দুসকে (পবিত্র আত্মা বা জিব্রাইলকে) পেয়ে থাকি এবং খোদার সঙ্গে কথাবার্তা বলতে পারি এবং ঐশী নিদর্শন দেখার সৌভাগ্য লাভ করি।'

(তিরইয়াকুল কুলুব, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১৫, পৃ:১৪১)

সমগ্র জগতের পথপ্রদর্শক নবী

"আমাদের নবী (সা.) সমগ্র জগতের মানুষকে আধ্যত্মিকভাবে উন্নত করার জন্য এসেছিলেন। এই কারণে এই গুণটি তাঁর মধ্যে পরম পরাকাষ্ঠা অর্জন করেছিল। এই মর্যাদা সম্পর্কেই কুরআন করীম একাধিক বার সাক্ষ্য প্রদান করেছে আর আল্লাহ্ তা'লার গুণাবলীর পাশাপাশি এই ভঙ্গিতেই আঁ হযরত (সা.) -এর গুণাবলী উল্লেখ করেছে। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন- مَآ اَرْسَلْنٰكَ اِلَّا رَحْمَةً لِّلْعٰلَمِيْنَ (আম্বিয়া, আয়াত: ১০৮) অনুরূপভাবে বলেছেন- قُلْ يٰٓاَيُّهَا النَّاسُ اِنِّيْ رَسُوْلُ اللّٰهِ اِلَيْكُمْ جَمِيْعًا[1] (আল আরাফ, আয়াত: ১৫৯) । কুরআন শরীফের অন্যান্য স্থানগুলি অধ্যয়ন করলে বোঝা যায যে, আঁ হযরত (সা.)-কে আল্লাহ্ তা'লা 'উম্মি' (নিরক্ষর) বলে অভিহিত করেছেন। কারণ আল্লাহ্ তা'লা ছাড়া তাঁর কোন শিক্ষক ছিলেন না, তথাপি তিনি নিরক্ষরই ছিলেন। কুরআন করীম অধ্যয়ন করলে বিস্মিত হতে হয় যে, এই নিরক্ষর ব্যক্তিই আমাদেরকে কেবল গ্রন্থ এবং প্রজ্ঞা শেখাচ্ছেন না, বরং আত্মশুদ্ধির পথ সম্পর্কেও অবহিত করছেন। এমনকি কুরআন মজীদের এই আয়াত اَيَّدَهُمْ بِرُوْحٍ مِّنْهُ-এ বর্ণিত মর্যাদায় পৌঁছে দিয়েছেন। (মুজাদিলা, আয়াত: ২৩) দেখ এবং চিন্তা কর, কুরআন করীম প্রত্যেক প্রকৃতির অন্বেষণকারীকে তাদের অভিপ্সীত গন্তব্যে পৌঁছে দেয় এবং সাধুতা এবং সত্যের প্রত্যেক পিপাসুকে পরিতৃপ্ত করে। কিন্তু লক্ষ্য করে দেখ, এই প্রজ্ঞা ও তত্ত্বজ্ঞানের প্রবাহ এবং সত্য ও জ্যোতির প্রস্রবণ কার উপর অবতীর্ণ হয়েছে? সেই মহম্মদ (সা.)-এর উপরই, একদিকে যাকে নিরক্ষর বলা হচ্ছে, কিন্তু অপরদিকে ঐশী তত্ত্বজ্ঞানের এমন পরাকাষ্ঠা ও সত্য তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হচ্ছে যে, পৃথিবীর ইতিহাসে তার কোন তুলনা পাওয়া যায় না।

(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃ: ১০৪)

সমগ্র জগতবাসীকে অন্ধকার থেকে আলোর দিকে পথপ্রদর্শনকারী নবী

আমাদের নবী (সা.) সত্য প্রকাশের লক্ষ্যে এক মহান সংস্কারক ছিলেন। তিনি অবলুপ্ত সত্যকে পুনরায় ধরাতে নিয়ে এসেছেন। এ গৌরবে আমাদের নবী (সা.)-এর সাথে অন্য কোন নবীই শরীক নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সারা পৃথিবীকে এক অন্ধকারে পেয়েছেন আর তাঁর আবির্ভাব সেই অন্ধকারে আলোতে বদলে গেছে। যে জাতিতে তিনি এসেছেন ততক্ষণ তিনি মৃত্যু বরণ করেন নি যতক্ষণ সেই জাতি পৌত্তলিকতার আবরণ খুলে একত্ববাদের আবরণ পরে নিয়েছে। শুধু এটাই নয়, বরং তাঁরা ঈমানের উন্নত মার্গে পৌঁছে গেছেন এবং তাঁদের নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততা ও ঈমানের এমন কার্যাবলী সাধিত হয়েছে যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না। এ সাফল্য এবং এ মার্গের সফলতা আঁ হযরত (সা.) ছাড়া অন্য কোন নবীর ভাগ্যে জোটে নি। আঁ হযরত (সা.)-এর নবুয়তের সত্যতার পক্ষেই এটিই একটি বড় প্রমাণ যে, তিনি এমন এক সময়ে প্রেরিত ও আবির্ভুত হয়েছেন, যখন যুগ চরম পর্যায়ের অন্ধকারে হাবুডুবু খাচ্ছিল আর স্বভাবতঃই এক মহান সংস্কারককে হাতছানি দিয়ে ডাকছিল। অতপর তিনি এমন একটি স ময়ে ইন্তেকাল করেছেন যখন লক্ষ লক্ষ মানুষ শিরক ও মূর্তিপূজা পরিত্যাগ করে তওহীদ (একত্ববাদ) ও সঠিক পথকে অবলম্বন করেছিল। আর প্রকৃত পক্ষে এই কামেল ও পরিপূর্ণ সংশোধন তাঁরই (সা.)বিশেষত্ব। তিনি একটি বন্য স্বভাবের ও পশু প্রকৃতির জাতিকে মানবীয় অভ্যাস শিখিয়েছেন। অথবা অন্য কথায় বলা যায়, পশুকে তিনি মানুষ বানিয়েছেন আর মানুষকে শিক্ষিত মানুষে পরিণত করেছেন এবং শিক্ষিত মানুষকে খোদা-প্রেমিক বানিয়েছেন এবং তাদের মাঝে আধ্যাত্মিকতার নিগুঢ় মন্ত্র ফুৎকার করেছেন এবং সত্য খোদার সাথে তাদের সম্পর্ক স্থাপন করে দিয়েছেন। তাদেরকে খোদার পথে ছাগলের মত জবাই করা হয়েছে। তারা পিপীলিকার মত পদতলে পিষ্ট হয়েছেন; কিন্তু ঈমানকে নষ্ট হতে দেননি, বরং সব বিপদের সময় সামনে অগ্রসর হয়েছেন। তাই নিঃসন্দেহে আমাদের নবী (সা.) আধ্যাত্মিকতা প্রতিষ্ঠার নিরিখে দ্বিতীয় আদম ছিলেন। বরং সত্যিকার আদম তিনিই ছিলেন যাঁর মাধ্যমে এবং যাঁর কল্যাণে মানবীয় গুণাবলী উৎকর্ষ লাভ করেছে এবং পুণ্য শক্তিসমূহ স্ব স্ব কাজে নিয়োজিত হয়েছে। মানব প্রকৃতির কোন শাখা ফুল-ফল শূন্য থাকে নি। নবুয়ত তাঁর সত্তাতে শুধু যুগের পরিসমাপ্তি কারণে শেষ হয় নি, বরং নবুয়তের পরাকাষ্ঠা তাঁর ভিতর পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। তাছাড়া তিনি যেহেতু ঐশী গুণাবলীর পরিপূর্ণ বিকাশস্থল ছিলেন তাই তাঁর শরীয়ত যুগপৎ জালালী ও জামালী (প্রতাপ ও সৌন্দর্যের) বৈশিষ্ট্যে মণ্ডিত ছিল। তাঁর দুটি নাম মুহাম্মদ আহমদের (সা.)-এ পিছনে এটিই উদ্দেশ্য। তাঁর সার্বজনীন নবুয়তে কার্পণ্যের কোন দিক নেই; বরং সূচনা থেকেই তা বিশ্বজনীন।

(লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২০৬)

উৎকৃষ্টতম পবিত্র ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা দানকারী

আমাকে বলা হয়েছে যে, সমস্ত ধর্মের মধ্যে ইসলামই হল সত্য ধর্ম এবং সমস্ত হিদায়তসমূহের মধ্যে কেবল কুরআনের হিদায়তই অক্ষত এবং মানবীয় হস্তক্ষেপ মুক্ত। আমাকে বোঝানো হয়েছে যে, সমস্ত রসূলের মধ্যে পরিপূর্ণ, উৎকৃষ্টতম, পবিত্র ও প্রজ্ঞাপূর্ণ শিক্ষা দানকারী। এবং নিজের জীবনযাপন দ্বারা মানবীয় পরাকাষ্ঠার সর্বোৎকৃষ্ট নুমনা প্রদর্শনকারী হলেন হযরত সৈয়্যাদানা ও মৌলানা মহম্মদ মুস্তাফা (সা.)

(আরবাঈন, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৭-৮)

আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেছেন–

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰن অর্থাৎ, তাঁর মহান চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে যদি জানতে চাও তাহলে কুরআন পড় আর তিনিই (সা.) কুরআনের তফসীর।

আল্লাহ্ তা'লা বলেন,

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন।

শুভ পরিণতি তখন সামনে আসবে যখন রসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রকৃত অর্থে অনুসরণ করা হবে। নতুবা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে জিগির তোলাও অন্তঃসারশূন্য আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) বলে শ্লোক আওড়ানোও অর্থহীন হবে।

খোদাপ্রেম এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)–এর অনুসরণের পরিবর্তে জগৎ প্রেমকেই এখন অগ্রগণ্য করে রাখা হয়েছে। এটিই কি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর অনুসরণ ও অনুকরণ? আমি সত্য বলছি, কোন ব্যক্তি প্রকৃত পুণ্য সম্পাদনকাী এবং খোদার সন্তুষ্টি অর্জনকারী হিসেবে আখ্যায়িত হতে পারে না, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে রসুলুল্লাহ (সা.)এর আনুগত্য ও অনুসরণে বিলীন না হয়।

আঁ হযরত (সা.) মহান মর্যাদা ও অতুলনীয় সম্মানের বিষয়ে অন্তর্দৃষ্টিসম্পন্ন বর্ণনা

মহানবী (সা.) এর মহান মর্যাদা ও সম্মান সংবলিত ভাষণ
যা হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) ২০ই অক্টোবর, ২০১৭ তারিখে জুমার খুতবায় প্রদান করেছিলেন।

সৌজন্যে: আল-ফযল ইন্টারন্যাশনাল লন্ডন

أَشْهَدُ أَنْ لَّا إِلٰهَ إِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ

أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ- بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ-

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ- الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ- مٰلِكِ يَوْمِ الدِّيْنِ- اِيَّاكَ نَعْبُدُ وَاِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ-

اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ- صِرَاطَ الَّذِيْنَ اَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّآلِّيْنَ-

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللّٰهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْاٰخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيْرًا. (الاحزاب-22)

আজকে আমরা দেখি যে, সবচেয়ে বেশি নৈরাজ্যকর অবস্থা মুসলমান দেশসমূহ এবং মুসলমান দলগুলোর মাঝে রয়েছে। তারা পরস্পরের বিরুদ্ধে খড়গহস্ত। সবাই 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' পড়ে ঠিকই কিন্তু অন্য 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' পাঠকারীকে তারা হত্যা করে, তাদের অধিকার পদদলিত করে, যে কোনভাবে তাদের ক্ষতি করার চেষ্টা করে। অতএব, এটি কী কুরআনী শিক্ষা, যার ওপর এরা আমল করছে? এটি কী রসূলে করীম (সা.)–এর উত্তম আদর্শ, যার এরা অনুসরণ করছে? আজকে আমরা দেখি যে, বস্তুবাদিতা সর্বত্র প্রাধান্য পাচ্ছে আর ধর্মের নাম নিলেও তা রাজনৈতিক স্বার্থে এবং নিজেদের ক্ষমতা প্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে বা টিকিয়ে রাখার উদ্দেশ্যে।

মহানবী (সা.)–এর উত্তম আদর্শ সম্পর্কে হযরত আয়েশা (রা.)–এর স্বর্ণালী হরফে লেখা উক্তি রয়েছে যে, "কানা খুলুকুহুল কুরআন" অর্থাৎ, তাঁর জীবনাদর্শ এবং তাঁর আচরণ বিধি সম্পর্কে যদি জানতে হয় তাহলে কুরআন হল তাঁর পবিত্র জীবনের বিশদ ব্যাখ্যা, তা পাঠ কর। আর এই আদর্শ তিনি এ জন্য প্রতিষ্ঠা করেছেন যে, মু'মিন ও তাঁর মান্যকারীরা যেন তা অনুসরণ করে, কেবল জিগির তোলার জন্য নয়। আল্লাহ্ তা'লাও বলেন, আমার সাথে সত্যিকার সম্পর্ক কেবল 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ'–র বুলি আওড়ালে প্রতিষ্ঠিত হবে না বরং আমার ভালোবাসা যদি পেতে হয় তাহলে আমার প্রেমাষ্পদ রসূলের অনুসরণ কর, তাঁর আদর্শ অনুকরণ কর, তাহলে আমার প্রিয়ভাজন হবে। তোমরা সেই মর্যাদা লাভ করবে যা খোদার নৈকট্যে ধন্য করে। নতুবা তোমাদের জিগির তুলা হবে অন্তসারশূন্য। আল্লাহ্ তা'লা বলেন, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللّٰهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, তোমরা যদি আল্লাহ্কে ভালোবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ তোমাদের ভালোবাসবেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ্ অতীব ক্ষমাশীল, বার বার কৃপাকারী। (সূরা আলে ইমরান : ৩২)

প্রশ্ন হল খোদা যাকে ভালোবাসেন তার অবস্থা কি এমন হতে পারে যা ইদানীংকার মুসলমানদের অবস্থা? সাধারণ মুসলমানরা আলেম সমাজকে খোদার প্রিয়ভাজন মনে করে, তাঁর নিকটতর জ্ঞান করে আর তারাই পৃথিবীতে সবচেয়ে বেশি নৈরাজ্য সৃষ্টি করছে। খোদ পাকিস্তানেই কিছু বিশ্লেষক ও কলামিষ্ট পত্রপত্রিকায় লেখা আরম্ভ করেছে এবং অন্যান্য প্রচারমাধ্যমও বলা শুরু করেছে যে, মুসলমানদের এই করুণ পরিণতির মুখে ঠেলে দিয়েছে আজকের এই নামসর্বস্ব আলেমরা। অতএব, এখন মুসলমানদের সার্বিক অবস্থা এই দাবি করে যে, কুরআন ও সুন্নতের প্রকৃত অর্থ তুলে ধরার মত কেউ থাকা উচিত। আর স্বীয় প্রতিশ্রুতি অনুসারে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন। কিন্তু আলেমরা নিজেরাও তাঁর কথা শুনতে চায় না আর জনসাধারণকেও শুনতে দেয় না। বরং খোদার পক্ষ থেকে আগমণকারী ব্যক্তির বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়া দিয়ে এক সর্বগ্রাসী ভীতি, ত্রাস, নৈরাজ্য ও ফ্যাসাদের পরিবেশ সৃষ্টি করে রেখেছে।

প্রতিনিয়তই হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)–এর বিরুদ্ধে এই প্রতিবাদ আরোপ করা হয় যে, জাগতিক কামনা–বাসনা চরিতার্থ করার জন্য এবং নিজের অহমিকার বশবর্তী হয়ে তিনি জামা'ত গঠন করেছেন, নাউযুবিল্লাহ।

যাইহোক, আমরা জানি যে, তিনি (আ.) মহানবী (সা.)–এর নিবেদিতপ্রাণ সত্যিকার প্রেমিক ছিলেন। তাঁর শরিয়তের সংস্কার এবং ইসলাম প্রচার ও প্রসারের কাজকে সম্পূর্ণতা দানের লক্ষ্যেই আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে পাঠিয়েছেন। কুরআনী জ্ঞান এবং নিগূঢ় তত্ত্বের ব্যুৎপত্তি তাঁর মাধ্যমেই আমরা লাভ করেছি। তিনি বিভিন্ন সময় কুরআনী শিক্ষার

আলোকে আমাদের পথের দিশা দিয়েছেন। অতএব, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ –এ আয়াতটি তিনি বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন স্থানে, বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন অর্থে উপস্থাপন করেছেন। এই বিষয়গুলিই খোদার নৈকট্যে ধন্য করে, তাঁর প্রিয়ভাজন করে, ফেতনা বা নৈরাজ্যের অবস্থা থেকে মুক্তির মাধ্যম হতে পারে। স্বীয় অস্তিত্বের নিশ্চয়তা এবং দেশে শান্তি বজায় রাখার জন্য এবং ইসলামের মহিমা ও মাহাত্ম্য প্রকাশের জন্য মুসলমানদের কাছে এছাড়া অন্য কোন উপায় নেই। শুভ পরিণতি তখন সামনে আসবে যখন রসূলুল্লাহ (সা.) কে প্রকৃত অর্থে অনুসরণ করা হবে। নতুবা 'লাইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলে জিগির তোলাও অন্তঃসারশূন্য আর মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) বলে শ্লোক আওড়ানোও অর্থহীন হবে।

এই আয়াতের ব্যাখ্যায় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) যা কিছু লিখেছেন সেখান থেকে আমি কিছু উদ্ধৃতি আপনাদের শোনানোর জন্য নিয়ে এসেছি।

একস্থানে তিনি (আ.) বলেন–

"মুসলমানদের অন্তর্কলহের কারণও হল এই জগৎ প্রেম। কেননা, যদি খোদার সন্তুষ্টি অগ্রগণ্য হত তাহলে এটি সহজেই বোধগম্য ছিল যে, অমুক ফেরকার নীতি বেশি স্বচ্ছ ও স্পষ্ট এবং তারা তা গ্রহণ করে এক হাতে একত্রিত হত। এখন যেখানে জগৎ প্রেমের কারণেই এই বিপত্তি দেখা দিচ্ছে তখন আর তারা রসূলুল্লাহ (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করছে না, তবে এমন লোকদের কীভাবে মুসলমান বলা যেতে পারে? যখন কিনা । আল্লাহ্ তা'লা তো বলেছিলেন– قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ অর্থাৎ, তুমি বল! তোমরা যদি খোদাকে ভালোবাসার দাবি রাখ তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ্ তা'লা তোমাদেরকে বন্ধুর মর্যাদা দিবেন। খোদাপ্রেম এবং মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণের পরিবর্তে জগৎ প্রেমকেই এখন অগ্রগণ্য করে রাখা হয়েছে। এটিই কি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর অনুসরণ ও অনুকরণ? রসূলে করীম (সা.) কি বস্তবাদী ছিলেন? তিনি কি নাউযুবিল্লাহ সুদ গ্রহণ করতেন? অবশ্যিক দায়িত্বাবলী এবং খোদার নির্দেশাবলী পালনে ঔদাসীন্য প্রদর্শন করতেন? তাঁর মাঝে কি নাউযুবিল্লাহ কপটতা ছিল? তিনি কি জগতকে ধর্মের ওপর প্রাধান্য দিতেন? গভীরভাবে চিন্তা করে দেখ! অনুসরণ হল, মহানবী (সা.)-এর পদাঙ্ক অনুসরণ করা আর এরপর দেখ! খোদা কীভাবে কৃপা বর্ষণ করেন।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩৪৮-৩৪৯)

কিন্তু আজকাল ব্যবহারিক দৃষ্টিতে মুসলমানদের অবস্থা এবং খোদার কর্মগত সাক্ষী এর বিপরীত হওয়া এ কথার সাক্ষী যে, তারা অধঃপতনের দিকে যাচ্ছে। দেশে দেশে যুদ্ধ চলছে, ভিন জাতির কাছে গিয়ে আমাদের এক মুসলমান দেশ অন্য মুসলমান দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার জন্য অনুনয় বিনয় করছে।

সম্প্রতি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট ইরানের ওপর পুনরায় নিষেধাজ্ঞাআরোপের ঘোষণা দিয়েছে আর তা বাস্তবায়নের জন্য কাজ চলছে। এ পেক্ষিতে সমগ্র ইউরোপ, ইউরোপিয়ান ইউনিয়ন এবং অন্যান্য দেশ এর বিরোধী। আর এখানে ইংল্যান্ডে একজন কলামিস্ট লিখেছেন যে, সারা পৃথিবী আমেরিকার প্রেসিডেন্টের এই পদক্ষেপের বিরোধী কিন্তু শুধুমাত্র তিনটি দেশ এমন রয়েছে যারা বলে, আমেরিকা খুব ভালো কাজ করেছে। সেই দেশগুলোর একটি হল আমেরিকা নিজেই, দ্বিতীয়টি ইসরাইল আর তৃতীয়টি হল সৌদি আরব। সৌদি আরব একটি অমুসলিম দেশকে মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার অনুমতি দিচ্ছে বরং যুদ্ধে তাদের সঙ্গ দিচ্ছে। অতএব, এই হল মুসলমানদের অবস্থা। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এরই চিত্র অংকন করে বলেছেন যে, তোমরা তো বহুধা বিভক্ত। কীভাবে তোমরা খোদার কৃপাভাজন হতে পার?

মানুষ কীভাবে সত্যিকার পুণ্য বা নেকী করতে পারে আর তারা কীভাবে আল্লাহ্ তা'লার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারে এবং খোদার নেয়ামতরাজিতে ভূষিত হতে পারে আর হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) নিজে কীভাবে এ সমস্ত নেয়ামতে ধন্য হয়েছেন। হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে বিভিন্ন ফতওয়া দিয়ে বলা হয় যে, নাউযুবিল্লাহ রসূলে করীম (সা.)-এর শিক্ষা থেকে তিনি বিচ্যুত ছিলেন, ইসলামী শিক্ষা থেকে বিচ্যুত ছিলেন। এ বিষয়ে বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি (আ.) বলেন–

''আমি সত্য সত্য বলছি (আর অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে বলছি) কোন ব্যক্তি প্রকৃত পুণ্যবান এবং খোদার সন্তুষ্টিভাজন বলে বিবেচিত হতে পারে না আর সেসব নেয়ামত, বরকত, তত্ত্বজ্ঞান,গূঢ় রহস্য ও দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতায় ধন্য হতে পারে না যা উচ্চমার্গের আত্মশুদ্ধির ফলে লাভ হয়। (উচ্চমার্গের আত্মশুদ্ধি লাভ হলে মানুষ এ পর্যায়ে পৌঁছে আর তখনই সে খোদার পক্ষ থেকে এ সমস্ত পুরস্কার ও বরকত পায়, দিব্যদর্শনের অভিজ্ঞতা লাভ করে আর খোদার সাথে তার বাক্যালাপ হয়।) তিনি (আ.) বলেন, রসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্যে আত্মবিলীন না হওয়া পর্যন্ত (এ মর্যাদা লাভ হয় না) আর এর প্রমাণ পাওয়া যায় স্বয়ং আল্লাহ্ তা'লার বাণীতে যে, قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ খোদার এই দাবির ব্যবহারিক এবং জীবন্ত প্রমাণ হলাম আমি। "(মালফুযাত, ১ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২০৪)

এ যুগে খোদা তা'লা আমার সাথে বাক্যালাপ করেন, কারণ আমি হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর সত্তায় বিলীন হয়ে গিয়েছি, তাঁর অনুসরণ করেছি আর এর ফলে খোদা তা'লা আমাকে স্বীয় ভালোবাসায় সিক্ত করেছেন।

অতএব, নিন্দুকেরা হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর বিরুদ্ধে আপত্তি করে যে, তিনি মহানবী (সা.)-এর অবমাননা করেছেন। অথচ তিনি (আ.) বলেন, এই পদমর্যাদা আমি রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রতি প্রেম, ভালোবাসা এবং তাঁর পূর্ণ অনুসরণের কল্যাণে লাভ করেছি । পৃথিবীর মানুষ যাকে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মর্যাদা অবমাননাকারী বলে মনে করে তিনিই সত্যিকার নবী-প্রেমী, যিনি সত্যিকার অর্থে রসূলুল্লাহ(সা.)-এর অনুসরণ ও অনুগমণ করেছেন আর খোদাও এমন দানে ধন্য করেছেন যে, তাঁর প্রেমিককে ভালোবাসার কারণে খোদা তাকে স্বীয় প্রেমাস্পদের মর্যাদা দিয়েছেন।

এই পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্যের কল্যাণে খোদা তা'লা তার প্রতি যে দায়িত্ব ন্যস্ত করেছেন সে সম্পর্কে তিনি (আ.) বলেন–

"আমাকে প্রেরণ করা হয়েছে রসূলে করীম (সা.)-এর হারিয়ে যাওয়া মাহাত্ম্য পুণঃপ্রতিষ্ঠার জন্য এবং কুরআনের সত্যতা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য আর এসব কাজই চলছে কিন্তু যাদের চোখে পর্দা রয়েছে তারা এটি দেখতে পায় না।" (মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৪)

পুনরায় এ আয়াতের ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) আরেক জায়গায় বলেন–

" তাদেরকে তুমি বলে দাও! তোমরা যদি খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদা এবং নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা পেতে চাও তাহলে এর একটি মাত্রই পথ রয়েছে আর তা হল তোমরা আমার অনুসরণ কর। (এটি এ আয়াতের অনুবাদ) তিনি (আ.) বলেন, (তবে) এর মর্ম কী যে, আমার অনুসরণ এমন একটি বিষয় যা ঐশী রহমতের ক্ষেত্রে নিরাশ হতে দেয় না, পাপ থেকে পরিত্রাণ লাভের কারণ হয় এবং খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদা দান করে [মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ ও অনুগমণ করা হলে তা পাপ থেকে ক্ষমা লাভের কারণ হয় আর শুধু এতটাই নয় বরং খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদা দান করে।] তিনি (আ.) বলেন, আল্লাহ্ তা'লাকে তোমাদের ভালবাসার দাবি তখনই সত্য এবং সঠিক প্রমাণিত হবে যখন তোমরা আমার অনুসরণ করবে [অর্থাৎ মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করবে।] তিনি (আ.) বলেন, এ আয়াত থেকে স্পষ্টভাবে প্রতিভাত হয় যে, মানুষ নিজের প্রস্তাবিত কোন সংগ্রাম, সাধনা এবং মন্ত্র-তন্ত্র দ্বারা খোদার ভালোবাসা ও নৈকট্যের ভাগীদার হওয়া যায় না। ঐশী জ্যোতিঃ ও কল্যাণরাজী কারো ওপর বর্ষিত হতে পারে না, যতক্ষণ না সে রসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্যে বিলীন হয়। যে ব্যক্তি মহানবী (সা.)-এর ভালোবাসায় আত্মবিলীন হয় এবং তাঁর

ইমামের বাণী

তোমাদের জন্য সাহাবাগণের আদর্শ রয়েছে। লক্ষ্য কর, কিভাবে তাঁরা জগত বিমুখ হয়ে গিয়েছিলেন।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩১)

দোয়াপ্রার্থী: Azkarul Islam, jamat Ahmadiyya Amaipur (Birbhum)

ইমামের বাণী

যতক্ষণ পর্যন্ত না পরীক্ষা আসে, ঈমান কোন মূল্য রাখে না। অনেক মানুষ আছে, পরীক্ষার সময় যাদের পদস্খলন ঘটে এবং কষ্টের সময় ঈমান দোদুল্যমান হয়ে পড়ে।(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৫৮)

দোয়াপ্রার্থী: Shujauddin and Family , Barisha (Kolkata)

আনুগত্য ও অনুসরণে সকল প্রকার মৃত্যুকে বরণ করে সে সেই ঈমানের জ্যোতিঃ এবং ভালোবাসা দান করা হয় যা গায়রুল্লাহ্ -র(খোদা ভিন্ন অন্যদের) থাবা থেকে মুক্তি দেয় আর পাপ থেকে পরিত্রাণ ও মুক্তি লাভের কারণ হয়। এ পৃথিবীতেই সে এক পবিত্র জীবন লাভ করে এবং প্রবৃত্তির কামনা বাসনার সংকীর্ণ ও অন্ধকার গহ্বর থেকে তাকে উদ্ধার করা হয়। এ হাদীস এদিকেই ইঙ্গিত করে- (মহানবী (সা.) বলেছেন) اَنَا الْحَاشِرُ الَّذِیْ یُحْشَرُ النَّاسُ عَلٰی قَدَمِیْ অর্থাৎ, আমি সেই সকল মৃতের পুনরুত্থান ঘটাব যার পায়ে মানুষকে পুনরুত্থিত করা হয়।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড,পৃষ্ঠা: ১৮৩)

তিনি আধ্যাত্মিক মৃতদের জীবন দাতা, তাঁর অনুসারীরা খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত হয়।

আরেক জায়গায় এর ব্যাখ্যায় তিনি (আ.) আরো বলেন, মহা সৌভাগ্য লাভের জন্য আল্লাহ্ তা'লা একটিই মাত্র পথ খোলা রেখেছেন আর তা হল মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর আনুগত্য করা, যেভাবে এই আয়াতে স্পষ্টভাবে বলেছেন قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ, এসো! আমার অনুসরণ কর যেন খোদাও তোমাদের সাথে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক রাখেন। এর অর্থ কেবল এটি নয় যে, প্রথাগতভাবে ইবাদত করবে। ধর্মের প্রকৃত তত্ত্ব যদি এটিই হয় তাহলে নামাযই কী আর রোযাই বা কী? নিজে একটি বিষয় থেকে বারণ করেন আবার নিজেই তা করবে। (প্রথাগত নামায নয় বরং যথাযথভাবে নামায পড় আর যথা সময়ে নামায পড়া আবশ্যক। আর এভাবে ইবাদত কর যেন তুমি খোদার সামনে দণ্ডায়মান রয়েছ অন্যথায় এসবই প্রথাগত ইবাদত।) তিনি (আ.) বলেন, ইসলাম কেবল এর নাম নয় (বরং) ইসলাম হল কুরবানীর প্রাণীর মত মাথা পেতে রাখা। যেভাবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) বলেছেন- আমার মৃত্যুবরণ, আমার জীবিত থাকা, আমার নামায এবং আমার সমস্ত ত্যাগ স্বীকার, এসবই কেবল আল্লাহ্‌র জন্য। আর সর্বপ্রথম আমি নিজে আত্মসমর্পণ করছি।"

(মালফুযাত, ২য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১৮৬)

অতএব, সত্যিকার অনুসারীরা নিজেদের ইবাদতের মানকে উন্নত করে। তাই আমাদের সবার আত্মজিজ্ঞাসা করা উচিত। এই দৃষ্টিকোণ থেকে আত্ম -জিজ্ঞাসা করা প্রয়োজন অন্যথায় আমাদের অনুসরণের দাবিও অন্তঃসারশূন্য বলে বিবেচিত হবে।

মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ একত্ববাদী হওয়া সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

" আল্লাহ্ তা'লার উক্তি হল, হে রসূল! তুমি তাদের বলে দাও তোমরা যদি খোদাকে ভালোবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, (এটি আয়াতের অনুবাদ) তাহলে খোদা তোমাদেরকে তাঁর প্রেমাস্পদের মর্যাদা দিবেন। মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণ ও আনুগত্য মানুষকে খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদায় উপনীত করে যা থেকে বুঝা যায় তিনি পূর্ণ একত্ববাদীর দৃষ্টান্ত ছিলেন। "

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৫)

অর্থাৎ, এর দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন এবং এ দলিল উপস্থাপন করেছেন যে, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) পূর্ণ একত্ববাদী ছিলেন। তিনি সেই মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন যেখানে অন্য কারো পৌঁছানো সম্ভব নয়। এজন্য ইবাদতের ক্ষেত্রেও আল্লাহ্ তা'লা তাঁকেই আদর্শ বানিয়ে দিয়েছেন যেভাবে তিনি অন্যান্য নৈতিক গুণাবলীর ক্ষেত্রেও সর্বোত্তম আদর্শ।

পুনরায় আরেক জায়গায় তিনি (আ.) বলেন-

" মানুষ নিজের মাঝে খোদার ভালোবাসা পূর্ণরূপে ততক্ষণ সৃষ্টি করতে পারে না যতক্ষণ সে নবী করীম (সা.)-এর চারিত্রিক গুণাবলী, পবিত্র জীবনাদর্শ এবং রীতিনীতিকে নিজের পথ প্রদর্শক হিসেবে অবলম্বন না করবে। কেননা, আল্লাহ্ তা'লা নিজে এ সম্পর্কে বলেন- قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ, খোদার প্রেমাস্পদ হওয়ার জন্য আবশ্যক হল রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অনুসরণ করা। সত্যিকার অনুসরণ হল নিজের মাঝে তাঁর উন্নত চারিত্রিক গুণাবলীর প্রতিফলন ঘটানো।"

(মালফুযাত, ৩য় খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৮৭)

অতএব, একটি হল ইবাদতের ধরণ আর অন্যটি হল চারিত্রিক গুণে গুণান্বিত হওয়া। সত্যিকার অনুসরণের অর্থই হল সেই মহান চারিত্রিক গুণাবলী যার কথা কুরআনে উল্লেখ রয়েছে তা নিজের মাঝে সৃষ্টি করা। যেভাবে পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে হযরত আয়েশা সিদ্দিকা (রা) বলেছেন- كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْاٰن অর্থাৎ, তাঁর মহান চারিত্রিক গুণাবলী সম্পর্কে যদি জানতে চাও তাহলে কুরআন পড় আর তিনিই (সা.) কুরআনের তফসীর। কাজেই, এ দৃষ্টিকোণ থেকেও আমাদের কুরআন পড়া উচিত। অন্যদেরকে কিছু বলার পূর্বে নিজেদের অবস্থা খতিয়ে দেখতে হবে যে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-কে মেনে কুরআনকে আমরা নিজেদের জীবন বিধান হিসেবে কতটা অবলম্বন করেছি। এটি বয়আতেরও অংশ। আরো দেখতে হবে যে, আমরা সত্য ও ন্যায়পরায়ণতাকে কতটা প্রতিষ্ঠিত করেছি এবং মানুষের প্রাপ্য প্রদানের ক্ষেত্রে আমরা কতটা সচেষ্ট।

আরেক স্থানে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

" স্বীয় যোগ্যতা বলে কেউ খোদার সাথে সাক্ষাতের সামর্থ্য রাখে না, এজন্য একটি মাধ্যম থাকা প্রয়োজন। আর সে মাধ্যম হল কুরআন করীম এবং রসূলে করীম (সা.)। যে ব্যক্তি তাঁকে ত্যাগ করে সে কখনো সফলকাম হবে না। বস্তুতঃ, মানুষ বান্দা বা দাস আর দাস বা ভৃত্যের কাজ হল প্রভু যে নির্দেশ দেন তা শিরোধার্য করা। অনুরূপভাবে, তোমরা যদি মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর কল্যাণে কল্যাণমণ্ডিত হতে চাও তাহলে তাঁর ভৃত্যদের অন্তর্ভুক্ত হওয়া আবশ্যক। কুরআনে আল্লাহ্ তা'লা বলছেন, قُلْ یٰعِبَادِیَ الَّذِیْنَ اَسْرَفُوْا عَلٰۤی اَنْفُسِهِمْ (সূরা আয যুমার : ৫৪) [অর্থাৎ, তুমি বলে দাও, হে আমার বান্দারা যারা নিজেদের ওপর অবিচার করেছ।] এখানে বান্দা বলতে দাস বা ভৃত্য বুঝানো হয়েছে মাখলুক বা সৃষ্টি নয়। মহানবী (সা.)-এর দাস হওয়ার জন্য আবশ্যক তাঁর প্রতি দরূদ প্রেরণ করা, তাঁর কোন নির্দেশ অমান্য না করা এবং সেই সমস্ত নির্দেশের ওপর প্রতিষ্ঠিত থাক যেভাবে আল্লাহ্ তা'লার নির্দেশ রয়েছে যে, قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ, তোমরা যদি খোদাকে ভালোবাসতে চাও তাহলে নবী করীম (সা.)-এর পূর্ণ অনুসরণকারী হয়ে যাও এবং রসূলে করীম (সা.)-এর পথে বিলীন হয়ে যাও আর তবেই খোদা তা'লা তোমাদের ভালোবাসবেন।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৩২১-৩২২)

অতএব, চরম পাপীও যদি ইস্তেগফার করে এবং মহানবী (সা.)-এর অনুসরণ করে আর সত্যিকার অর্থেই নিজের জীবনে পরিবর্তন আনতে চায় তাহলে সে খোদার প্রিয়ভাজন হতে পারে।

পুনরায় তিনি (আ.) বলেন -

"খোদাকে সন্তুষ্ট করার একটিই মাধ্যম তা হল রসূলে করীম (সা.) এর সত্যিকার অনুসরণ করা। প্রায় দেখা যায়, মানুষ বিভিন্ন প্রকার কুপ্রথায় লিপ্ত হয়। কেউ মারা গেলে বিভিন্ন প্রকার বেদাত এবং আচার-অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করা হয়, অথচ কেবল মৃতের পক্ষে দোয়া করা উচিত। বিভিন্ন কুপ্রথা অনুসরণ করেই কেবল রসূলুল্লাহর (সা.)-এর বিরোধিতাই করা হয় না বরং তাঁর অবমাননা করা হয়।" নতুন নতুন যে সমস্ত আচার অনুষ্ঠান প্রবর্তন করা হয় এটি তাঁর নির্দেশ অমান্য করাই নয়, বরং পক্ষান্তরে তাঁর অবমাননাই করা হয় । যারা রসূল অবমাননার (বিরুদ্ধে) আইন পাশ করেছে তারা সবচেয়ে বেশি এসব বিদাত এবং কুপ্রথায় লিপ্ত। আর এটি এই অর্থে রসূলুল্লাহর কীভাবে অবমাননা করা হয়?তা এই অর্থে তিনি বলেন- " যেন রসূলুল্লাহকে যথেষ্ট মনে করা হয় না। যদি যথেষ্ট মনে করা হত তাহলে নিজেদের পক্ষ থেকে বিভিন্ন কুপ্রথা উদ্ভাবন করার প্রয়োজন কি ছিল?"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃষ্ঠা:৪৪০)

অতএব, যারা আমাদের বিরুদ্ধে কুফরি ফতওয়া জারি করে তাদের নিজেদের আচরণের দিকে দৃষ্টি দেওয়া উচিত। তিনি আরো বলেন-

" যদি তোমরা খোদাকে ভালোবাস তবে আমাকে অনুসরণ কর। এরফলে খোদা তোমাদের ভালোবাসবেন, তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিবেন। অতএব, এই আয়াত থেকে প্রমাণ হয় মানুষ যতক্ষণ পর্যন্ত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর পূর্ণ অনুসরণকারী হবে না, সে খোদা থেকে সেই কল্যাণরাজী লাভ করতে পারে না এবং সেই তত্ত্বজ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি লাভ করতে পারে না, যা তার পাপে কলুষিত জীবন এবং কামনা বাসনার অগ্নিকে নির্বাপিত করতে পারে। এমন মানুষরাই 'উলামাউ উম্মাতি' অর্থের অন্তর্গত।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৯৬-৯৭)

প্রবৃত্তির কামনা বাসনাকে যদি প্রশমিত করতে হয় তবে পূর্ণ অনুসরণের প্রয়োজন, তাঁর জীবনাদর্শ অনুকরণের প্রয়োজন। প্রকৃত তত্ত্বজ্ঞান এবং

অন্তদৃষ্টি যদি অর্জন করতে হয়, খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত হয়ে তবে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুসরণ করা আবশ্যক। পাপে কলুষিত জীবন থেকে মুক্তি পেতে হলে তাঁর অনুসরণ করা আবশ্যক। যারা অনুসরণ করে তারা সেই মর্যাদায় উপনিত হয় যা সম্পর্কে রসূলুল্লাহ বলেছেন, আমার উম্মতের আলেমরা ইসরাঈলী নবীদের সদৃশ।

(আলমওযুআতুল কুবরা: মোল্লা আলি কারী, পৃষ্ঠা: ১৫৯, হাদীস নং: ৬১৪)

কিন্তু বর্তমান যুগের আলেমরা এর অন্তর্গত নয়; তারা সেই মর্যাদা পেতে পারে না। কেননা এরা মহানবী (সা.) প্রবহমান কল্যাণরাজীতে বিশ্বাসী নয়, এরা বিশ্বাসই করে না যে এই মর্যাদা লাভ হতে পারে।

পুনরায় মহানবী (সা.) এর পবিত্র মর্যাদা সম্পর্কে তিনি বলেন-

" তাঁর সবচেয়ে বড় আধ্যাত্মিক মর্যাদা হল তিনি ছিলেন খোদার প্রেমাস্পদ কিন্তু খোদা তা'লা অন্যদেরকেও এই মর্যাদায় উপনীত হওয়ার পন্থা শিখিয়েছেন। যেমন তিনি বলেন: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ তাদেরকে বলে দাও যদি তোমরা খোদার প্রেমাস্পদের মর্যাদা পেতে চাও তাহলে আমার অনুসরণ কর খোদা তোমাদেরকে স্বীয় প্রেমাস্পদের মর্যাদা দিবেন। [রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মাধ্যমে খোদা তা'লা এই ঘোষণা করিয়েছেন] একটু ভেবে দেখ, মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর পূর্ণ অনুসরণ খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত করে এর বাইরে আর কি চাই মানুষের। "

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৬৫)

আরেক জায়গায় তিনি বলেন-

" যে ব্যক্তি বলে, রসূলুল্লাহর অনুসরণ ছাড়া মুক্তি পাওয়া সম্ভব, এমন ব্যক্তি মিথ্যাবাদী, আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে যে কথা বুঝিয়েছেন তা সম্পূর্ণভাবে এর পরিপন্থী। আল্লাহ্ তা'লা বলছেন: قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ হে রসূল মুহাম্মদ (সা.)! এদেরকে বলে দাও যদি খোদাকে তোমরা ভালোবাসার দাবি কর তাহলে এস আমার অনুসরণ কর, তাহলে খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত হবে। মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর (সা.) অনুসরণ ছাড়া কোন ব্যক্তি মুক্তি পেতে পারে না। যারা রসূলুল্লাহর প্রতি বিদ্বেষ রাখে তাদের পরিণাম শুভ হবে না।"

(মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ৪৩৪-৪৩৫)

এই হল আমাদের ঈমানের অংশ । মহানবী (সা.) এর পবিত্র মর্যাদা সম্পর্কে এক খ্রিষ্টানের সাথে তাঁর বিতর্ক চলছিল। সেই খ্রিষ্টান ঈসা (আ.) এর পবিত্র মর্যাদার সম্পর্কে বলে যে, হযরত ঈসা (আ.) নাকি নিজের সম্পর্কে বলেছেন- " যারা ক্লান্ত, পরিশ্রান্ত তারা আমার কাছে এসো, আমি তোমাদের আরাম দিব"। [আর ঈসা (আ.) নিজের সম্পর্কে একথাও বলেছেন যে] আমিই জ্যোতিঃ আর আমিই পথ (অর্থাৎ আমিই জ্যোতিঃ আর আর আমিই পথ-প্রদর্শনকারী, জীবনদাতা, আমার কাছে এসো) সেই খ্রিষ্টান প্রশ্ন করে যে, ইসলামের প্রতিষ্ঠাতা মুহাম্মদ (সা.) কি এমন শব্দ বা এ ধরণের শব্দ কোন ক্ষেত্রে নিজের অনুকূলে ব্যবহার করেছেন? হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর উত্তরে বলেন যে, কুরআনে স্পষ্ট বলা হয়েছে- قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ এদেরকে বলে দাও যদি খোদাকে ভালোবেসে থাক তাহলে আস, আমার অনুসরণ কর যেন খোদা তোমাদের ভালোবাসতে পারেন এবং তোমাদের পাপ ক্ষমা করেন। 'আমার অনুসরণের মাধ্যমে খোদার প্রিয়ভাজন হয়'- এই প্রতিশ্রুতি ঈসা (আ.) এর পূর্বোক্ত উক্তির চেয়ে বেশি জোরালো, কেননা, খোদার প্রিয় ভাজন হওয়ার চেয়ে বড় কোন মর্যাদা আর হতে পারে না। [ঈসা (আ.) বলেছেন যে তিনি আলো, পক্ষান্তরে রসূলুল্লাহকে আল্লাহ বলেন যে, তুমি ঘোষণা কর যে আমার অনুসরণ করবে সে খোদার প্রিয়ভাজন হবে, প্রেমাস্পদে পরিণত হবে, তার পাপও ক্ষমা করা হবে।] যার পথ অনুসরণ করা মানুষকে খোদার প্রেমাস্পদে পরিণত করে, তার চেয়ে বেশি অধিকার কার আছে যে নিজেকে আলো হিসেবে আখ্যায়িত করবে।"

ইমামের বাণী

আধ্যাত্মিকতায় উন্নতির প্রথম সিড়ি হল নামায। যৌবনকালের ইবাদত খোদা তা'লার নিকট বিশেষ গ্রহণযোগ্যতা রাখে।

(২০১৯ সালে জার্মানীতে খুদ্দামুল আহমদীয়ার ইজতেমা উপলক্ষ্যে বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Sk. Zakir Hossain Sb, District Amir, Bankura

(সীরাজুদ্দীন খৃষ্টানের চারটি প্রশ্নের উত্তর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃষ্ঠা: ৩৭২)

এটি সেই যুগ ছিল যখন সর্বত্র খ্রিষ্টান পাদ্রীরা খ্রিষ্ট ধর্মের প্রচার করছিল। ভারতে লক্ষ লক্ষ মুসলমান খ্রিষ্ট ধর্মে দীক্ষিত হয়েছিল। ইসলামকে রক্ষা করার যোগ্যতা মুসলমান আলেম এবং অন্যান্য নেতাদের ছিল না। রসূলে করীম (সা.) এর পবিত্র মর্যাদা এবং মহিমা এমন ভাবে তুলে ধরতে সক্ষম ছিল না যার মাধ্যমে অমুসলিমদের মুখ বন্ধ হতে পারত। এমন সময় হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-ই তাদের মোকাবেলা করেছেন, তিনিই সেই ব্যক্তি ছিলেন যাকে খোদা ইসলাম এবং মুহাম্মদ (সা.)-এর পবিত্র মর্যাদা পৃথিবীর সামনে তুলে ধরার জন্য পাঠিয়েছেন। ভারতের ইতিহাস এ কথার সাক্ষী যে খ্রিষ্টান পাদ্রীদের ইসলামের ওপর হামলা এবং আক্রমণকে খোদার এই বীর-পুরুষ অকাট্য যুক্তি এবং প্রমাণের মাধ্যমে প্রতিহত করেছেন। আর কেবল প্রতিহতই করেন নি বরং তাদেরকে পিছু হটিয়েছেন। আর তখনকার মুসলমানরা এ কথা স্বীকার করেছে। ইতিহাসে এগুলো সংরক্ষিত আছে বরং এ যুগের আলেম যারা আমাদের বিরোধী তারাও এ কথা স্বীকার করেছে।

কয়েক বছর পূর্বে ড. ইসরার আহমদ সাহেব, যিনি বর্তমানে জীবিত নেই, তিনিও এ কথা স্বীকার করেছেন যে, সে যুগে সত্যিকার অর্থে ইসলামকে রক্ষার কাজ করেছেন মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.)। যাইহোক, এটি এক সত্য বিষয় যে, যেভাবে তিনি ইসলাম এবং রসূলে করীম (সা.) এর পবিত্র মর্যাদাকে উন্নীত করেছেন অন্য কোন মুসলমান আলেমের সেই সামর্থ্য বা যোগ্যতা ছিল না।

পুনরায় قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ আয়াতের ভিত্তিতে ঈসা (আ.) এর মৃত্যুকে খুব সুন্দরভাবে প্রমাণ করেছেন। আরবরা এখনও হযরত ঈসা (আ.) কে আকাশে জীবিত মনে করে আর এই ধারণা তাদের হৃদয়ে বদ্ধমূল হয়ে রয়েছে। যাইহোক যুক্তির মাধ্যমে এটি খণ্ডন করতে গিয়ে তিনি বলেন:

"আমার মতে মু'মিন সে-ই, যে তাঁর অনুসরণ করে আর সে-ই কোন আধ্যাত্মিক মর্যাদায় পৌঁছতে পারে যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলেছেন যে- قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ তাদের বলে দাও যদি খোদাকে ভালোবেসে থাক তাহলে আমার অনুসরণ কর, যেন আল্লাহ তোমাদেরকে প্রেমাস্পদের মর্যাদা দিতে পারেন। প্রেমের দাবি হল প্রেমাস্পদের কর্মের প্রতি বিশেষ ভালোবাসা ও অনুরাগের সম্পর্ক থাকা। মৃত্যুবরণ করা মহানবী (সা.)-এর সুন্নত ছিল, তাঁর জীবনের একটা সুন্নত অর্থাৎ তিনি মৃত্যু বরণ করেছেন, তিনি মৃত্যু বরণ করে দেখিয়েছেন। তাই কে আছে যে, জীবিত থাকতে পারে বা জীবিত থাকার বাসনা করে বা অন্য কারো জীবিত থাকার কথা তুলতে পারে? (তাঁর কোন মান্যকারী জীবিত থাকতে পারে না বা জীবিত থাকার বাসনাও রাখবে না যদি সত্যিকার অনুসারী হয়ে থাকে। আর কেউ জীবিত আছে এমন দৃষ্টিভঙ্গির উপর তার বিশ্বাস রাখাও উচিত নয়।) ভালোবাসার দাবি হল তার অনুসরণে এমনভাবে বিলীন হওয়া যেন কামনা বাসনাকে সে নিয়ন্ত্রণ করতে পারে আর যেন মনে করে যে সে তাঁরই অনুসারী। এমন পরিস্থিতিতে যে ব্যক্তি ঈসা সম্পর্কে এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, তিনি এখনও জীবিত এমন ব্যক্তি কীভাবে তাঁকে ভালোবাসার বা তাঁকে অনুসরণ করার দাবি করতে পারে? কেননা ঈসা (আ.) কে রসূলুল্লাহ(সা.)- এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ জ্ঞান করা এবং রসুলুল্লাহ (সা.)-কে মৃত বলা সে পছন্দ করে কিন্তু ঈসা (আ.)-এর জন্য এই বিশ্বাস রাখাই পছন্দ করে যে, তিনি জীবিত আছেন। " (মালফুযাত, ৮ম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ২২৮-২২৯)

একদিকে রসূলুল্লাহকে ভালোবাসার এবং তাঁকে অনুসরণ করার দাবি করবে অপর দিকে ঈসা (আ.) কে জীবিত আখ্যা দিয়ে তাঁকে শ্রেষ্ঠ আখ্যায়িত

শেষাংশ ১৮ পাতায়....

ইমামের বাণী

স্মরণ রেখো! পাপাচার ও দুরাচার উপদেশ কিম্বা অন্য কোনও উপায়ে দূর হওয়ার নয়। দোয়াই হল এর একমাত্র পন্থা।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৩২)

দোয়াপ্রার্থী: Golam Mustafa and family, Berhampore, Murshidabad.

আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ সম্পর্কে আঁ হযরত (সা.)-এর শিক্ষা

মূল রচনা (উর্দূ): মুনীর আহমদ খাদিম

একত্ববাদের প্রকৃত জ্ঞান, যা আধ্যাত্মিক উর্ধ্বভ্রমণের চরম শিখরে উপনীত ছিল,তা পৃথিবীতে প্রথম আঁ হযরত (সা.) এর মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছিল ; তাঁরই মাধ্যমে জগতবাসী প্রথমবারের মত এক-অদ্বিতীয় সত্তার 'আহাদ' গুণাবলী সম্পর্কে পরিচিত হয়েছিল। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) তফসীরে সাগীরে সূরা ইখলাসের অনুবাদ লেখার সময় পাদটিকায় লেখেন-

"শেষ তিনটি সূরার পূর্বে যে 'কুল' শব্দ রাখা হয়েছে, তাতে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে যে আমাদের এই বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দাও। আর একথা অবধারিত যে যখন মহম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.) খোদার বাণী মানুষের কাছে পৌঁছে দিবেন, তখন যেহেতু অন্যান্য সকলেই 'কুল' শব্দটি পাঠ করবে, তাই তাদের উপরও সেই বাণী অপরের কাছে পৌছে দেওয়ার দায়িত্ব বর্তাবে। অতএব কুল বলার মাধ্যমে একদিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করা হয়েছে যে,'আমার এই শিক্ষাকে তুমি নিজের মধ্যেই সীমাবদ্ধ রেখো না, অপরের কাছেও পৌঁছে দাও। আর যারা তোমার কাছে শোনে, তারা অপরের সামনেও যেন বর্ণনা করে, আর তারাও সেটিকে প্রচার করে। এইভাবে ক্রমেই সমগ্র বিশ্বে যেন খোদার বাণী পৌঁছে যায়। এই কারণেই আমি এর অনুবাদ করেছি, 'আমরা প্রত্যেক যুগের মুসলমানদেরকে আদেশ করছি', তুমি (মানুষকে) বলতে থাক। "

একবচনের জন্য আরবীতে দুটি শব্দ ব্যবহৃত হয়। 'ওয়াহেদ' এবং 'আহাদ' -যার অর্থ এক। কিন্তু 'একটি' বললে সঙ্গে সঙ্গে 'দ্বিতীয়টি'-র দিকে মনোযোগ যায়। আর বর্ণনাকারী মনে করে একের পর দুই আছে আর দুইয়ের পর তিন ও তিনের পর চার আছে। কাজেই এই শব্দটি যদিও এক হওয়ার সপক্ষে যুক্তি দেয়, কিন্তু পুনরাবৃত্তির সম্ভবনাকেও অস্বীকার করে না। এর বিপরীতে 'আহাদ' এর অর্থ একাকী, একাকীর পর কেউ 'দুকাকী' বলে না। অতএব, এই শব্দের অর্থ এই দাঁড়াল যে, এই সত্তার সঙ্গে অন্য কোন সত্তা বিদ্যমান থাকার সম্ভাবনা নেই। এই সূরায় আল্লাহ্ তা'লাকে 'আহাদ' বলা হয়েছে। অর্থাৎ তাঁর নিরঙ্কুশ একত্ববাদের উল্লেখ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে আল্লাহ্ তা'লা নিজ সত্তায় অনন্য। এই ধরণের অন্য কোন সত্তা থাকতে পারে- এমন কথা চিন্তাও করা যেতে পারে না। কাজেই এই সূরায় এই শব্দ প্রয়োগের মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লা নিজের নিরঙ্কুশ একত্বের ঘোষণা দিয়েছেন।

এখানে আরবী শব্দ 'সামাদ' ব্যবহৃত হয়েছে যার অর্থ 'স্বনির্ভর ও সর্বনির্ভর স্থল'। অর্থাৎ কারো মুখাপেক্ষী নয়, এমন কেউ নেই যে তাঁর মুখাপেক্ষী নয়, এমন কোন সত্তা নেই যা তার সাহায্য ব্যতিরেখে টিকে থাকতে পারে। অতএব, এই শব্দটিও পরিপূর্ণ একত্বকে প্রকাশ করেছে। এটি বর্ণনা করে যে, সমগ্র সৃষ্টিজগত তাঁর সাহায্য ছাড়া চলতে পারে না, কিন্তু তিনি স্বয়ং সৃষ্টিজগতের কোনও সাহায্যের মুখাপেক্ষী নন। চিরপ্রতিষ্ঠিত তথা অতীব মর্যাদাবান- 'সামাদ'-এর এই অর্থ দুটিও নিরঙ্কুশ একত্বের প্রমাণ দেয়। যে সত্তা চিরস্থায়ী ও চিরপ্রতিষ্ঠিত, সৃষ্টিজগতের কেউই তার প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে পারবে না আর যার মর্যাদা অসীমত্বকে স্পর্শ করে, অন্য কোন জিনিস তার নাগাল পায় না। এর অর্থও এটি বোঝায় যে তিনি অদ্বিতীয়।

এই আয়াতটিও পরিপূর্ণ একত্বের উপর পক্ষে যুক্তি দেয়। কেননা যে কাউকে জন্ম দেয় নি, সে হয় বন্ধ্যা কিম্বা এমন সত্তা যা পরিবর্তনশীল নয়। যেমন- পর্বত, নদী ইত্যাদি। কিন্তু খোদা তা'লার সম্পর্কে বলা হয়েছে যে তিনি 'রাফীউন', অর্থাৎ- স্বীয় মর্যাদায় অতীব উচ্চ। কাজেই পর্বত ও নদী তাঁর সঙ্গে আদৌ সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে না। আর তিনি জন্ম নেন নি- এই বাক্যও পরিপূর্ণ একত্বের সপক্ষে যুক্তি দেয়। কেননা খোদা তা'লা ছাড়া পৃথিবীতে এমন কোন সত্তা দেখা যায় না, যাকে কেউ কেউ জন্ম দেয় নি- তা সে উপাস্য নামে পরিচিত হোক বা না হোক।

প্রথমে সত্তাগত দিক থেকে একত্বের কথা উল্লেখ করা হয়েছিল, এখন গুণাবলীর একত্বের কথা বর্ণনা করা হয়েছে। মনে রাখতে হবে যে গুণাবলীর অংশীদার হওয়ার এই অর্থ নয় যে তাঁর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ কোন কাজ মানুষের দ্বারা হয় না। মানুষও শ্রোতা ও দ্রষ্টা আর খোদা তা'লাও শ্রোতা ও দ্রষ্টা। কাজেই বাহ্যত এখানে একটি সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হচ্ছে। কিন্তু খোদা তা'লা দ্রষ্টা, তবে চোখ দিয়ে দেখেন না, তিনি শ্রোতা কিন্তু কান দিয়ে শোনেন না। তিনি নিজে কোন উপকরণ ছাড়াই শোনেন এবং দেখেন। কাজেই মানুষ দ্রষ্টা ও শ্রোতা হলেও তাকে খোদা তা'লার গুণাবলীর অংশীদার বলা যেতে পারে না।

এছাড়াও আঁ হযরত (সা.)-এর আবির্ভাবের পূর্বে একত্ববাদের ধারণা নির্দিষ্ট যুগ ও স্থান পর্যন্তই সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু আঁ হযরত (সা.))-এর উপর যে ঐশী বাণী অবতীর্ণ হয়েছে, তাতে আল্লাহ্ তা'লাকে 'রাব্বুল আলামীন' অর্থাৎ সমগ্র জগতের 'রব' বা প্রভুপ্রতিপালক হিসেবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এই বাণী অনুসারে তাঁর সকল গুণাবলীকে যুগ ও স্থানের সীমানার উর্দ্ধে বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে।

একত্ববাদের তাৎপর্য এবং আঁ হযরত (সা.) দ্বারা উপস্থাপিত একত্ববাদের শ্রেষ্ঠত্ব বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেছেন-

'স্মরণ রাখিতে হইবে যে, প্রকৃত তৌহীদ, যাহার স্বীকৃতি খোদা আমাদের নিকট চান এবং যে স্বীকৃতির সহিত নাজাতের সম্বন্ধ রহিয়াছে, তাহা এই যে, খোদা তা'লাকে মুর্ত্তি, মানুষ, সূর্য, চন্দ্র, নিজাত্মা, প্রবৃত্তি, কিংবা আপনা চেষ্টা-প্রচেষ্টা, ফন্দিফিকির ইত্যাদি সকল প্রকার বস্তুর অংশীবাদিতা হইতে পবিত্র জ্ঞান করা। একত্বও সম্পূর্ণ তাই তাঁর সত্তার বৈশিষ্ট্য। তিনি অনন্য। তাঁহার মোকাবেলায় কোন শক্তিশালী জ্ঞান না করা। কাহাকেও অন্নদাতা স্বীকার না করা, কাহাকেও সম্মানদাতা বা লাঞ্ছনাকারী ধারণা না করা এবং কাহাকেও সাহায্যকারী নির্ধারণ না করা। দ্বিতীয় কথা এই যে, স্বীয় প্রেম একমাত্র তাঁহাকেই নিবেদন করা, এবাদতকে শুধু তাঁহার জন্যই নির্দিষ্ট করা, ভক্তিভরে একমাত্র তাঁহারই নিকটে বিনায়বনত হওয়া ও সকল আশা ভরসা একমাত্র তাঁহার উপরই স্থাপন করা এবং শুধু তাঁহাকেই ভয় করা। কোন তৌহীদ নিম্নলিখিত তিন প্রকার বৈশিষ্ট্য ছাড়া কামেল হইতে পারে না।

প্রথমত: সত্তা হিসাবে তৌহীদ। তাঁহার অস্তিত্বের সম্মুখে, যাহা কিছু আছে, সবই না থাকার না জ্ঞান করা এবং সমস্ত নশ্বর ও অসার মনে করা।

দ্বিতীয়ত: গুণের দিক হইতে তৌহীদ। অর্থাৎ সৃষ্টি, পালন ও ত্রাণ ইত্যাদি ঐশী গুণ, স্রষ্টার সত্তা ছাড়া কাহারও মধ্যে আরোপ না করা এবং বাহ্যিকভাবে যাহারা কর্মকর্তা ও কল্যাণ সাধনকারী বলিয়া দৃষ্টিগোচর হয়, তাহাদিগকে তাঁহারই পরিচালনাধীন বলিয়া প্রত্যয় করা। তৃতীয়তঃ প্রেম, নিষ্ঠা ও নির্মলতার দিক দিয়া তৌহীদ। অর্থাৎ উপাসনার উপাচার-প্রেমাদিতে অন্যকে খোদা তা'লার শরীক না করা এবং তাঁহাতেই বিলীন হওয়া।"

(খৃষ্টান সীরাজুদ্দীনের চারটি প্রশ্নের উত্তর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ৩৪৯)

অনুরূপভাবে তিনি আরও বলেন-

"আমি নেয়ামত বা উত্তম পুরস্কারের অস্বীকারকারী হব, যদি না আমি একথা স্বীকার করি যে, প্রকৃত তওহীদ আমি ঐ নবীর মাধ্যমেই লাভ করেছি। জীবিত খোদার পরিচয় আমি পেয়েছি ঐ কামেল ও পূর্ণ নবীর মাধ্যমেই, তাঁরই আলোকের মধ্য দিয়ে। খোদার সাথে কথা বলার এবং সম্বোধিত হওয়ার, যার মাধ্যমে আমরা খোদার চেহারা দেখে থাকি-তার সৌভাগ্য লাভ করেছি ঐ মহান নবীরই মাধ্যমে। ঐ হেদায়াতের সূর্যের রশ্মিমালা আমার উপরে প্রখর রৌদ্রের ন্যায় পতিত হয় এবং তার মধ্যে আমি যতক্ষণ পর্যন্ত দাঁড়িয়ে থাকতে পারি, ততক্ষণ আমি আলোকিত হতে থাকি।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, ২২তম খণ্ড, পৃষ্ঠা: ১১৫-১১৮)

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ১১৯)

অতঃপর বলেন:-

"আমাদের নবী (সা.) সত্য প্রকাশের লক্ষ্যে এক মহান সংস্কারক ছিলেন। তিনি অবলুপ্ত সত্যকে

পুনরায় ধরাতে নিয়ে এসেছেন। এ গৌরবে আমাদের নবী (সা.)-এর সাথে অন্য কোন নবীই শরীক নন। প্রকৃতপক্ষে তিনি সারা পৃথিবীকে এক অন্ধকারে পেয়েছেন আর তাঁর আবির্ভাব সেই অন্ধকারে আলোতে বদলে গেছে। যে জাতিতে তিনি এসেছেন ততক্ষণ তিনি মৃত্যু বরণ করেন নি যতক্ষণ সেই জাতি পৌত্তলিকতার আবরণ খুলে একত্ববাদের আবরণ পরে নিয়েছে। ”

লেকচার সিয়ালকোট, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২০, পৃ: ২০৬)

এরপর বলেন-

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৭, টিকা নম্বর-৬)

আঁ হযরত (সা.) এর সারাটি জীবন আল্লাহ্ তা'লার একত্ব এবং তাঁর বান্দেগী প্রতিষ্ঠায় ব্যতীত হয়েছে। তিনি নিজ সৃষ্টিকর্তাকে এতটাই ভালবাসতেন যার দৃষ্টান্ত পৃথিবীর কোথাও পাওয়া যায় না। এর সাক্ষ্য দান করতে গিয়ে আল্লাহ্ তা'লা বলেন- وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى অর্থাৎ আল্লাহ্ তা'লা তোমাকে স্বীয় ভালবাসায় নিমগ্ন পেয়েছেন, অতঃপর তিনি তোমার পথপ্রদর্শন করেছেন। অপরিসীম ঐশী ইবাদত এবং ভালবাসার পরিণামেই হিরা গুহায় তাঁর উপর ওহী অবতীর্ণ হয়। তাঁর প্রথম ওহীতেই একত্ববাদের মূল মন্ত্র দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহ্ তা'লা বলেন- اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ অর্থাৎ- নিজ সৃষ্টিকর্তার নামে পাঠ কর। (সূরা আলাক, আয়াত: ২) সুতরাং তিনি সারা জীবন এই বাণী পাঠ করতে থাকেন এবং অপরকে শিক্ষা দিতে থাকেন। তিনি সর্বক্ষণ নিজ সৃষ্টিকর্তার ধ্যানে আত্মবিলীন থাকতেন, এতটাই যে শত্রুরাও এই স্বীকারুক্তি দিতে বাধ্য হল যে, 'আশেকা মুহাম্মদু রাব্বাহু'। অর্থাৎ মহম্মদ তার প্রভুর ভালবাসায় উন্মাদ হয়ে পড়েছে। তিনি সব সময় আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা লাভের জন্য দোয়া করতেন। সচরাচর তিনি এই দোয়াটিই করতেন-

اَللّٰهُمَّ اِنِّیْ أَسْئَلُكَ حُبَّكَ وَحُبَّ مَنْ يُحِبُّكَ وَالْعَمَلَ الَّذِیْ يُبَلِّغُنِیْ حُبَّكَ

অর্থাৎ হে আল্লাহ্! আমি তোমার নিকট তোমার ভালবাসা যাচনা করি এবং সেই ব্যক্তির ভালবাসাও, যে তোমাকে ভালবাসে। আমি তোমার কাছে এমন কাজ করার সামর্থ প্রার্থনা করছি যা আমাকে তোমার ভালবাসার মর্যাদায় পৌঁছে দিবে।

ইসলামী শিক্ষার প্রথম নীতিই হল একত্ববাদের প্রতিষ্ঠা এবং এর ভিত্তি হল কলেমা 'লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। আঁ হযরত (সা.) -এর নিকট এই কলেমা তওহীদ এতটাই প্রিয় ছিল যে তিনি বলেছেন, যে ব্যক্তি সত্য অন্তঃকরণে এই কলেমা পাঠ করে, সে নিজের জন্য খোদা তা'লার সন্তুষ্টি এবং জান্নাতের দরজা খুলে দেয়। অনুরূপভাবে তিনি একবার তিনি বলেছিলেন- ***'আফযালুয যিকরি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ'*** অর্থাৎ যিকর-এর মধ্যে সর্বোত্তম হল কলেমা তওহীদ জপ করা। কোন বিপদ এলে তখনও তিনি এই বাক্য ভাষায় উচ্চস্বরে কলেমা তওহীদ পাঠ করতেন। ***''লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহুল আযিমুল হালীম''***। অর্থাৎ আল্লাহ্ ছাড়া কোনও উপাস্য নেই, তিনিই শ্রেষ্ঠত্ব ও সম্মানের অধিকারী এবং তিনিই সকলের সহায়। এই কলেমা তৌহিদের কারণে তিনি সকল দুঃখ-কষ্ট ভোগ করেছেন, আর সাহাবাদের এমন এক জামাত তৈরী করেছেন যারা কলেমা তওহীদের জন্য মজবুত পাহাড়ের ন্যায় দাঁড়িয়েছিলেন, এমনকি নিজেদের জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করেছিলেন। তিনি নিজ উম্মতকে শিক্ষা দিয়েছেন, দিনে অন্তত একশবার কলেমা তৌহিদ পাঠ করুন, যা নিম্নরূপ-

لَا اِلٰهَ اِلَّا اللّٰهُ وَحْدَهٗ لَا شَرِيْكَ لَهٗ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

ইসলামের নীতি ও একত্ববাদের মহান প্রজ্ঞা এই যে, এর পরিণামে সমগ্র জগতের মানুষ এক সূত্রে গ্রোথিত হয়ে এক বিশ্ব ভ্রাতৃত্ব রচিত হয় এবং সমগ্র সৃষ্টিজগত আল্লাহ্ তা'লার পরিবারের রূপ পরিগ্রহ করে এবং ঐক্যের সূত্রে গ্রোথিত থাকে আর সকলের দৃষ্টিকোণ ও অক্ষ এক বিন্দুতে এসে মিলিত হয়। অতএব, কলেমা তৌহিদই একমাত্র মন্ত্র যার দ্বারা সমগ্র জগতকে এক মঞ্চে ঐক্যবদ্ধ করা সম্ভব। অপরদিকে বহুশ্বেরবাদীরা কখনই একত্রিত হতে পারে না। এই জন্যই আঁ হযরত (সা.) এবং তাঁর সাহাবাগণ এই কলেমার উদ্দেশ্যে নিজেদের প্রাণ, সম্পদ, সন্তান-সন্ততি, মাতৃভূমি- যাবতীয় ত্যাগস্বীকার করেছেন, নিজেদের থেকে বহুগুণ শক্তিশালী শত্রুদের বিরুদ্ধে দাপটের সঙ্গে লড়াই করেছেন এবং শাহাদত বরণ করেছেন।

কলেমা তৌহিদ তাঁর কাছে এতটাই প্রিয় ছিল যে, প্রাণের শত্রুও যদি কলেমা পাঠ করত, তবে তিনি তাকে ক্ষমা করে দেওয়ার ঘোষণা করতেন। আর কোন সাহাবী কলেমা পাঠকারী কোন শত্রুকে হত্যা করলে ভীষণ অসন্তুষ্টি ব্যক্ত করতেন। হযরত উসামা বিন যায়েদ একবার যুদ্ধের সময় কলেমাপাঠকারী এক শত্রুকে হত্যা করেছিলেন আর আঁ হযরত (সা.)কে সেই ঘটনা শোনালে তিনি হযরত উসামার উপর ভীষণ রুষ্ট হন। উসামা বলেন, হুযুর! সে তো তরবারির ভয়ে কলেমা পাঠ করেছিল। তিনি (সা.))বললেন, তুমি কি তার অন্তর বিদীর্ণ করে দেখেছিলে যে, সত্যই সে তরবারির ভয়ে কলেমা পড়েছিল কি না?

কলেমা তৌহিদের জন্য আঁ হযরত (সা.)এর এমনই আত্মাভিমান ছিল যে, উহদের যুদ্ধের সময় একবার মুসলমানেরা যখন সাময়িক পরজয়ের সম্মুখীন হল আর আঁ হযরত (সা.) এবং মুসলমানেরা একটি অনুচ্চ পাহাড়ের কোলে গোপনে আশ্রয় নিলেন, তখন কুফফাররা মনে করল, তারা ইসলামের বড় বড় নেতাদের হত্যা করেছে। এই ধারণার বশবর্তী হয়ে তারা উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করল, 'তোমাদের মাঝে কি মহম্মদ (সা.) আছেন? আঁ হযরত (সা.) সাহাবাদেরকে নীরব থাকতে নির্দেশ দিলেন। এরপর তারা জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মাঝে কি আবু বাকার আছেন? আঁ হযরত (সা.) বললেন, নীরব থাক। পুনরায় তারা উচ্চ স্বরে জিজ্ঞাসা করল, তোমাদের মধ্যে কি উমর ও উসমান আছেন। মুসলমানদের পক্ষ থেকে সম্পূর্ণ নীরবতা দেখে তারা ধরে নিল যে এরা সকলে মারা গিয়েছেন। তাই তারা 'উলু হুবাল' -এর জয়ধ্বনি দিতে শুরু করল। অর্থাৎ হোবল প্রতিমার জয় হোক। শিরকপূর্ণ এই জয়ধ্বনি শুনে আঁ হযরত (সা.) এর তৌহিদের জন্য অভিমান জেগে উঠল, তিনি শিরকের জয়ধ্বনি সহ্য করতে পারলেন না। তিনি স্বয়ং মুসলমানদেরকে বললেন, তোমরা এর উত্তর দিচ্ছ না কেন? সাহাবারা বললেন, হুযুর! আমরা এর কি উত্তর দিব? তিনি বললেন, বল- আল্লাহু আলা ওয়া আজাল' অর্থাৎ আল্লাহ্র মর্যাদা উচ্চ ও শ্রেষ্ঠ।

বদরের যুদ্ধের সময় এক মুশরিক বলল, যদি যুদ্ধলব্ধ সম্পদের থেকে তাকে কিছু দেওয়া হয়, তবে সে সাহায্যের জন্য যেতে প্রস্তুত। আঁ হযরত (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, সে কি মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত? সে জানাল যে সে মুসলমান হওয়ার জন্য প্রস্তুত নয়। আঁ হযরত (সা.) বললেন, আমি কোন মুশরিকের সাহায্য নিতে পারব না।

তৌহিদের শ্রেষ্ঠত্ব প্রকাশ এবং তৌহিদের জয়ধ্বনি দেওয়ার এই দৃশ্য মক্কা বিজয়ের সময় গোটা পৃথিবী প্রত্যক্ষ করেছে যে সেই বিজয়ের আনন্দের মধ্যে আল্লাহ্র মহত্ব এব মর্যাদা প্রকাশ করতে গিয়ে তাঁর মাথা উটের গদি পর্যন্ত আনত হয়ে আসে। অপরদিকে তিনি

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ إِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوقًا

এর জয়ধ্বনি উচ্চকিত করেন।

তৌহিদের প্রতি এই ভালবাসাই তিনি সাহাবাদের মধ্যে সৃষ্টি করেছিলেন। এক আনসারী সাহাবী, যিনি মসজিদে কুবায় নামায পড়তেন, তাঁর সম্পর্কে বর্ণনা করা হয় যে, প্রত্যেকে সেই নামাযে যাতে উচ্চস্বরে তিলাওয়াত করা হয়, তাতে কেবল সূরা ইখলাস পাঠ করতেন অর্থাৎ 'কুলহু আল্লাহু আহাদ' পাঠ করতেন। সাহাবারা আঁ হযরত (সা.)এর কাছে এই বিষয়টি জানালে সেই সাহাবী নিবেদন করেন, হুযুর! এই সূরাটি আল্লাহ্ তা'লার একত্ববাদ সংবলিত, এই কারণে আমার খুব প্রিয়। হুযুর (সা.) বললেন, এই সূরার প্রতি ভালবাসা তোমার জান্নাতে যাওয়ার পথ সুগম করবে।

আঁ হযরত (সা.) আজীবন আল্লাহ্ তা'লার মাহাত্ম্য ও একত্ববাদের পাঠ দিয়ে এসেছেন, মৃত্যুর সময়ও

এরপর ১৭এর পাতায়

ইমামের বাণী

ইসলামকে অনেক দুর্যোগময় সময়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রান্ত হতে হয়েছে। সেই শরৎ অতীত হয়েছে, এখন বসন্ত এসেছে।

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড, পৃ: ১৬৫)

দোয়াপ্রার্থী: Nur Jahan Begum, Jamat Ahmadiyya kolkata

মহানবী (সা.) একজন অভিজ্ঞ মনস্তত্ত্ববিদ রূপে

মূল রচনা-মির্যা বশীর আহমদ এম.এ (রা.), অনুবাদ -মোরতোজা আলি (বড়িশা)

নবীগণের একটি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য

পৃথিবীতে বহু মানুষ এমন গত হয়েছেন যারা মনোবিজ্ঞানে পারদর্শী ছিলেন। বর্তমানে বিশেষ করে এই বিজ্ঞানের এই শাখাটি প্রভূত উন্নতি সাধন করেছে। কিন্তু গভীর দৃষ্টিতে দেখলে বোঝা যাবে যে, যারা নিজেদেরকে এই বিজ্ঞানের বিদ্বান বলে পরিচয় দেয়, তাদের জ্ঞান শুধু ততটুকুর মধ্যে সীমিত থাকে যতটুকু দ্বারা শুধুএর পরিভাষাগত দিকগুলো জানা যায়। আর কেউ যদি এই স্তর অতিক্রম করে এর প্রকৃত ব্যুতপত্তি অর্জন করেও নেয়, তবু সে শুধু এই বিদ্যার কলা-কৌশল পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে, তার বাস্তব অংশ যা প্রকৃতপক্ষে ইপ্সিত, তাহা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্জিত হয় না। শুধু মনস্তত্ত্ববিদ্যা সীমাবদ্ধ নয়, বিশ্বে বহু বিদ্যার এমন দৈন্যদশ্য লক্ষ্য করা যায়। লোকের জ্ঞানের সীমা পরিভাষার গণ্ডি থেকে অগ্রসর হয় না। যেভাবে অগ্রসর হয় তা শুধু জ্ঞানগত দিক পর্যন্ত সীমাবদ্ধ থাকে। বিদ্যাকে কার্যকরীভাবে প্রয়োগ করার কৌশল খুব কম মানুষই আয়ত্ব করতে পারে। দর্শনশাস্ত্রে যদি দেখ তাতে সহস্র লাখ এই বিদ্যার পণ্ডিত দেখা যাবে, কিন্তু তাদের বিদ্যা-বুদ্ধি পরিভাষা থেকে অগ্রসর হয় না। তাদের প্রিয় জীবন-কাল পরিভাষা অধ্যয়নে শেষ হয়ে যায়। এই বিদ্যার যা প্রকৃত উদ্দেশ্য হল ছিদ্রান্বেষী সমালোচনার প্রকৃত যোগ্যতা অর্জন করা, এথেকে অধিকাংশ লোক বঞ্চিত হয়ে থাকে। বরং অধিকাংশ সময় দার্শনিক লোকদের যুক্তিপ্রমাণ অত্যন্ত দুর্বল ও ভাসা-ভাসা হয়ে থাকে, কেননা পরিভাষিক অস্থিরতা তাদের মূল তত্ত্ব থেকে দূরে সরিয়ে দেয়। কিন্তু সাধারণ লোকের বিপক্ষে নবীদের অবস্থা অবলোকন করলে এই বৈশিষ্ট্য স্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। তাদের সমস্ত বিদ্যা বাস্তব ভিত্তিক। বরং তারা যদিও অনেক সময় বিদ্যার পারিভাষিক থেকে বাহ্যিক শিক্ষা কম সেই জন্য অবগত নন। প্রত্যেক বিদ্যা যা তাদের কর্মকাণ্ডের পরিধির সঙ্গে সম্পর্ক যুক্ত সেটিই তাদের প্রকৃত উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হয়ে থাকে। বা ভিন্ন বাক্যে বলা যায় সেই বিদ্যার সে পারদশী হয় এবং তার খুঁটিনাটি সম্পর্কে অবগত থাকে। এবং তারা ছাড়া অন্য কোন ব্যক্তি এই বিদ্যার পারদর্শী দেখা যায় না।

নবীগণ ও মনস্তত্ত্ববাদিতা

মনস্তত্ত্ববিদ্যা যদিও মানুষের মানসিক ও আন্তরিক গতিবিধি সংক্রান্ত জ্ঞান, তথাপি এটি নবীগণের বিশেষ জ্ঞানের অন্তর্ভুক্ত। কেননা শিক্ষা ও সংশোধনের কাজের সঙ্গে এর বিশেষ সম্পর্ক রয়েছে। বস্তত, শরিয়তের ভিত্তি এই বিদ্যার উপরই প্রতিষ্ঠিত। যেমন কুরআন শরীফে আমাদেরকে বলা হয়েছে এবং পারিপার্শ্বিক অবস্থা থেকে প্রকাশিত যে, নবীদেরও ধাপ আছে। যেমন যেমন কাজ নবীদের উপর ন্যস্ত করা হয়, সেই অনুযায়ী খোদা তা'লার পক্ষ থেকে তৌফিক (শক্তি-সামর্থ) দেওয়া হয় এবং বিদ্যার দ্বার উন্মুক্ত করা হয়।

রসুল করীম (সা.) এবং মনস্তত্ত্ববাদিতা

আমাদের নবী আঁ হযরত (সা.) যেহেতু 'খাতামান্নাবীঈন ছিলেন, পক্ষান্তরে বিগত নবীগণ (আ.) সমস্ত বিশ্বের সংশোধনের জন্য প্রেরিত হয়েছিলেন। তাঁর (সা.) বাণী কৃষ্ণাঙ্গ, শ্বেতাঙ্গ নির্বিশেষে সকলের জন্য ছিল, তাঁর শরিয়ত প্রত্যেক জাতি ও যুগের জন্য প্রেরিত হয়েছিল। এইজন্য স্বাভাবিকভাবে তাঁর (সা.) মধ্যে সেই শক্তি-সামর্থ দান করা হয়েছিল আর সেই সব জ্ঞান ও বিদ্যা তাঁকে দানকরা হয়েছিল যা বিরাট কর্মকাণ্ড সমাধা করার জন্য আবশ্যক ছিল। এতে কোন নবীর অবমাননা নয় যে, অন্য নবীদের কাহাকেও সেই জ্ঞান-বিদ্যা দেওয়া হয় নি, যা তাঁকে (সা.) দেওয়া হয়েছে ও কোন শক্তি নিয়ে আসেন নি যা নিয়ে তিনি (সা.) প্রেরিত হয়েছিলেন। অতএব, তিনি (সা.) বলেন, اَنَاسَيِّدُ وَلَدِاٰدَمَ وَلَافَخْرَ আমি আদম সন্তানদের নেতা, কিন্তু এই কারণে নিজ আত্মায় কোন অহংকার দেখতে পাইনি। যদিও আঁ হযরত (সা.) সর্বশ্রেষ্ঠ রসুল ছিলেন, তথাপি মনস্তত্ত্ব বিষয়ে জ্ঞাত হওয়া নবুয়তের অবশ্য কর্তব্য। এটা কার্যের সমাধা করার সাথে যেন অঙ্গাঙ্গীভাবে পরস্পর সম্পর্ক যুক্ত।

তিনি (সা.) সর্বপ্রথম ও সবার আগে থাকবেন। আমরা দেখি তিনি (সা.) প্রকৃতপক্ষে এমনই ছিলেন। এ কারণে আঁ হযরত (সা.-এর থেকে আল্লাহ্ তা'লার শিক্ষা ও সংশোধনের বিরাাট কাজ নেওয়ার ছিল। এই রূপে বিদ্যা তাঁর (সা.) অস্তিত্বে প্রবেশ করিয়ে দেওয়া হয়েছিল। যেমন একটি উৎকৃষ্ট স্পঞ্জের টুকরো জলে ডুবিয়ে বের করার পর ভর্তি হয়ে যায়। একটি প্রাকৃতিক প্রস্রবণের ন্যায় এই বিদ্যার চিরসত্য তাঁর (সা.) থেকে নির্গত হত। যেহেতু আমার পক্ষে এই প্রবন্ধে সবদিক বর্ণনা করা সম্ভব নয়, বরং কোন একটি দিক এই বিষয়ে বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করা যেতে পারে। আমি এখানে অত্যন্ত সংক্ষিপ্তভাবে কয়েকটি উদাহারণ তাঁর বাণী থেকে বর্ণনা করব। যদ্বারা জ্ঞাত হওয়া যায় কিভাবে তিনি প্রতিটি বিষয়কে মনস্তত্ত্বের সনাতন মৌলিক ছাঁচে ঢেলেছিলেন। অধিক সংক্ষিপ্তভাবে আমি তাঁর বাণী থেকে শুধু এই অংশটুকু চয়ন করব যা দৈনন্দিন কথোপকথন ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে নির্গত কথার সাথে সম্পর্ক যুক্ত।

রসুল করীম (সা.) এর বাণীর উৎকর্ষতা

আমি পূর্বে বলেছি সাধারণ ভাষায় মনস্তত্ত্ব সেই বিদ্যার নাম যা মানুষের মনের ব্যাখ্যা এবং তার কাজের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। এই বিদ্যায় মন ও অন্তরের প্রভাবকে নিয়ে আলোচনা করা হয়। এতে বলা হয় মানুষ কিভাবে পারিপার্শ্বিকতা থেকে প্রভাবিত হয়। তার ভাব ধারার স্রোতে কিভাবে এবং কোন মূলনীতির অধীনে চলে ইত্যাদি। আঁ হযরত (ষা.) এর বাণীতে এই উৎকর্ষ ছিল। এতে একক বা দলের সম্বোধন মানসিক অবস্থার সম্পূর্ণ বিবেচনা করা হত। কেননা একক বা দলের ভাবধারা সংশোধনের জন্য যা উত্তম পন্থা হতে পারে, সেই অনুসারে তাঁর মুখ নিঃসৃত কল্যাণময় বাণী নির্গত হত। অতএব, আল্লাহ্ তা'লার ইচ্ছায় অন্যভাবে হোক, প্রতিটি কথা শ্রোতাদের অন্তরে লোহার পেরেকের ন্যায় প্রোথিত হয়ে যেত। তিনি সম্বোধকদের ভাবধারা ভূল পথে যাওয়া দেখে বা তাদের ভূল পথে যাওয়ার সম্ভাবনা দেখে, তৎক্ষণাৎ এমন কথা বলতেন, যা শ্রোতাদের মানসিক গতিবিধি পরিবর্তিত হয়ে যেত। এমন দৃষ্টান্ত তাঁর জীবনের হাজার হাজার পাওয়া যায়। সমস্ত জীবনই এর দৃষ্টান্ত। কিন্তু আমি এখানে উদাহরণ স্বরূপ কয়েকটি দৃষ্টান্ত বর্ণনা করে বিরতি করব।

বদরের যুদ্ধের ঘটনার দৃষ্টান্ত

বদর যুদ্ধের ঘটনায় যখন মুসলমান সৈন্যরা সম্মুখীন হয় নি এবং প্রায়ই মুসলমানরা এই বিষয়ে অবগত ছিল না কাফেরদের একটি সৈন্যবাহিনী মক্কার দিকে অগ্রসর হচ্ছে ও এই ধারণার বশবর্তী হয়ে গৃহ হতে বাহির হয়েছিল যাত্রী দলের মুখোমুখি হবে বলে। সেই সময়ে কিছু সাহাবা মক্কার এক সৈন্য যা তাদের একটি ঝরণার নিকট সাক্ষাত হয়েছিল, তাকে আঁ হযরত (সা.) -এ সমীপে গ্রেপতার করে হাজির করল। তিনি (সা.) কাফেরদের সেনাবাহিনী সম্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ করলেন। পুনরায় জিজ্ঞাসা করলেন, মক্কার প্রধান প্রধান নেতারা কে কে সঙ্গে আছেন। সে বলল, উতবা, শায়বা, উম্মিয়া, নজর বিন হারিস, উকবা, আবু জেহেল, আবুল বাখতারি, হাকিম বিন হাজজাম ও প্রমুখ সঙ্গে আছেন। এই সমস্ত লোক যেহেতু কোরায়েশ গোত্রের জীবন প্রবাহ ছিলেন এবং অত্যন্ত বীর ও বাহাদুর প্রধান সেনাপতি বলে পরিচিত ছিল, তাই তিনি (সা.) তাদের নাম শুনে জ্ঞাত হলেন মক্কার নামী লোকেরা মুসলমানদের মূলোৎপাটন করতে বাহির হয়েছে। সাহাবারা বিচলিত হয়ে পড়লেন। আঁ হযরত (সা.) তাদের দিকে লক্ষ্য করে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বললেন,

هٰذِهٖ مَكَّةُ قَدْاَلْقَتْ
اِلَيْكُمْ اَفْلَاذَ كَبِدِهَا-

(মক্কা তো তোমাদের সম্মুখে নিজেদের হৃদয়ে টুকরো বের করে দিয়েছে। অর্থাৎ- তোমরা আনন্দিত হও, খোদা তোমাদের জন্য এতবড় শিকার একত্রিত করে দিয়েছেন। সাহাবাদের ভাবধারা তৎক্ষণাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল। এটাতো বিচলিত হওয়ার সময় নয়, খোদার প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী কাফের প্রধানদের আমাদের হাতে ধ্বংস করার জন্য একত্রিত করে দিয়েছেন। অতএব সেই সংবাদ যা দুর্বল চিত্তের মুসলমানদের শঙ্কা ও ভীতির হেতু হতে পারত আঁ হযরত (সা.) এর অকস্মাৎ মুখ নিঃসৃত একটি কথা তাদের জন্য আনন্দ ও শক্তিদানের হেতু হয়ে গেল। আঁ হযরত (সা.) এই বাক্য কোন চিন্তাধারার ফলস্বরূপ বলেন নি, তিনি এদিকে মক্কার সৈন্যের মুখ থেকে এই কথা শুনলেন এবং সাহাবাদের মুখের দিকে তাকিয়ে অস্থিরতার চিহ্ন দেখলেন আর

ঐদিকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে তাঁর (সা.)-এর মুখ থেকে এই কথা বের হল। যেমন একটি তির ধনুকের তন্দ্রী থেকে বের হয়, এই কথার ফলে মুসলমানদের ভাবধারার গতি পরিবর্তিত হয়ে নিমেষে দিক পরিবর্তন হয়ে গেল।

মক্কা বিজয়ের ঘটনার দৃষ্টান্ত

মক্কা বিজয়ের ঘটনায় আঁ হযরত (সা.) মক্কার প্রধান আবু সুফিয়ানের প্রতি মনস্তুষ্ট করতে সম্মত ছিলেন। তিনি (সা.) তার সাথে এই ব্যাপারে কিছু প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। যখন ইসলামি সৈন্যবাহিনী অত্যন্ত আড়ম্বতার সাথে পতাকা উড়িয়ে মক্কার দিকে অগ্রসর হল এবং আবু সুফিয়ান একটি উঁচু জায়গায় বসে এই আড়ম্বরতা অবলোকন করছিলেন,তখন তার সামনে দিয়ে পার হয়ে হযরত সাদ বিন উবাদা (রা.) আনসারদের প্রধান ও নিজ গোষ্ঠীর প্রধান ও পৃষ্ঠপোষক ছিলেন, তিনি আবু সুফিয়ানকে শুনিয়ে শুনিয়ে বললেন, 'আজ মক্কাবাসীদের লজ্জার দিন। আবু সুফিয়ানের অন্তরে এই কথা ছুরির ন্যায় বিদ্ধ হল। তিনি সঙ্গে সঙ্গে আঁ হযরত (সা.) কে বললেন, 'আপনি শুনেছেন, সাদ (রা.) কি বলেছে?' সাদ (রা.) বলেছে আজ মক্কাবাসীদের লজ্জার দিন। '

তিনি (সা.) বললেন, 'সাদ ভুল বলেছে, আজ তো মক্কাবাসীদের গৌরবের দিন। সা'দ (রা.) এর নিকট থেকে নেতৃত্বের পতাকা নিয়ে তাঁর ছেলেকে দেওয়া হোক।'

এটা একটা আকস্মিক কথা ছিল। কিন্তু দেখা যায় এতে মনস্তত্ত্বের কত সনাতন সত্য লুক্কায়িত আছে। প্রথম বিষয় এটা যে, মক্কাবাসীদের লাঞ্ছনার কথা থেকে বোঝা যাচ্ছিল যেন আঁ হযরত (সা.) মক্কায় প্রবেশ করলে মক্কাবাসীদের লাঞ্ছনা, অথচ মক্কা বিজিত হলেও যখন তা আঁ হযরত (সা.) -এর পতাকা তলে চলে আসছে তখন তো কেবল সম্মানের কথাই বলা যায়। এছাড়াও মক্কা এমনই এক মর্যাদার স্থানে অধিষ্ঠিত, যার দিকে কখনই লাঞ্ছনা আরোপ করা যায় না। দ্বিতীয়ত: সা'দের কথা ও তাঁর বাচনভঙ্গির কারণে মুসলমানদের হৃদয়ে আবু সুফিয়ানের বিষয়ে অবজ্ঞাসূচক মনোভাব সৃষ্টি হতে পারত, কিন্তু আঁ হযরত (সা.) তাকে স্বান্ত্বনা দিতে চাইছিলেন। সেই কারণেই তিনি তৎক্ষণাৎ আবু সুফিয়ানের অভিযোগের ভিত্তিতে সা'দকে সতর্ক করেন এবং মুসলমানদের চিন্তাধারাকে ভুল পথে পরিচালিত হওয়া থেকে রক্ষা করেন। তৃতীয়ত, যেহেতু সাদের মুখ থেকে এই কথাটি মুখ ফসকে বের হয়েছিল, অপরদিকে তিনি নিজের গোত্রের গোত্রপতিও ছিলেন, একথা ভেবে আঁ হযরত (সা.) যথাসম্ভব চেষ্টা করেছেন যেন তারও অসম্মান না হয়, তাই তিনি তাঁর হাত থেকে নেতৃত্বের পতাকা নিয়ে নেওয়ার নির্দেশ দিলেন, কিন্তু সেই সঙ্গে আদেশ দিলেন পতাকাটি তাঁর কাছ থেকে নিয়ে তাঁর ছেলের হাতে তুলে দিতে, যাতে সা'দের মনেও স্বান্ত্বনা হয় আর অন্য কেউ তাঁর প্রতি শ্লেষাত্মক মন্তব্য করার সুযোগ না পায়। লক্ষ্য করে দেখুন, আঁ হযরত (সা.) এর এই কয়েকটি মাত্র কথা যা অবলীলায় তাঁর মুখ থেকে নিঃসৃত হয়েছিল, তাতে তাঁর দৃষ্টি কোন কোন স্থানে পৌঁছেছিল। যেন এক নিমেষেই তাঁর বাণী একাধিক চেতনার দরজা বন্ধ করে দিয়েছিল যার থেকে ক্ষতির সমূহ সম্ভাবনা ছিল, অপরদিকে একাধিক মনের কল্যাণকর দরজাগুলিকে উন্মুক্ত করেছিল।

হুনাইনের যুদ্ধের সময়ের দৃষ্টান্ত।

হুনাইনের যুদ্ধের পর যখন যুদ্ধলব্ধ সম্পদ বিতরণের সময় এল, তখন আঁ হযরত (সা.) মক্কাবাসীদের তুষ্ট করার কথা ভেবে তাদেরকে পরিমাণে বেশি দেন। মুষ্টিমেয় অত্যুৎসাহী ও স্বল্পবুদ্ধির আনসার বিষয়টি নিয়ে আপত্তি তুলে বলল, 'আমাদের তরবারি থেকে রক্ত ঝরছে, কিন্তু মক্কাবাসী পুরস্কার নিয়ে গেল। এই সংবাদ আঁ হযরত (সা.)-এর কর্ণগোচর হলে তিনি আনসারদের পৃথক স্থানে একত্রিত করে বললেন, তিনি এই এই কথা শুনেছেন। লোকেরা ছাগল ভেড়া, উট নিয়ে নিয়ে গেল আর আল্লাহ্‌র রসুল তোমাদের সঙ্গে যাচ্ছেন, তোমরা কি এতে প্রীত হও নি? আনসারগণ ফুপিয়ে কেঁদে ওঠেন, কাঁদতে কাঁদতে তাঁদের হিচকি বন্ধ হয়ে যায়। তাঁরা বললেন, 'হে আল্লাহ্‌র রসুল! আমাদের মধ্য থেকে কিছু নির্বোধ যুবকের মুখ থেকে একথা বেরিয়ে পড়েছিল। আমরা খোদার রসুলকে সঙ্গে নিয়ে যাব, জাগতের ধন-সম্পদের প্রতি আমাদের কোন মোহ নেই। আঁ হযরত (সা.) বললেন, ' হে আনসারদের দল! তোমরা জান্নাতে 'হাউজে কাউসার'-এই মিলিত হইয়ো।

মনোবিজ্ঞানের অধীনে এই ঘটনার প্রথমাংশের ব্যাখ্যা স্পষ্ট, কোনও ব্যাখ্যার প্রয়োজন নেই। কিন্তু তাঁর শেষ বাক্যটির ক্ষেত্রে কিছুটা ব্যাখ্যার প্রয়োজন আছে। বাক্যটি অত্যন্ত স্পষ্ট ও সরল যা মনোবিজ্ঞানের ছাঁচে গড়ে সুন্দরভাবে বেরিয়ে এসেছে। তিনি এর দ্বারা বোঝাতে চেয়েছিলেন, 'তোমাদের মধ্য থেকে কতিপয় জগতের মোহে নিপতিত, যার কারণে তোমরা পৃথিবীতে সেই ঐশী পুরস্কার থেকে বঞ্চিত থাকবে যা পৃথিবীর পুরস্কারাজির মধ্য থেকে সব থেকে বড় পুরস্কার। অর্থাৎ সাম্রাজ্য ও কর্তৃত্বক্ষমতা। কিন্তু একথা ভেবো না যে তোমাদের নিষ্ঠা ও ত্যাগ-তিতিক্ষা ব্যর্থ হল। না, এর কারণে তোমরা পরকালে হউজে কাউসারে সাক্ষাত করো। সেখানে তোমরা পরকালের পুরস্কাররাজি দ্বারা তোমাদের ঝুলি পূর্ণ করে দেওয়া হবে, খোদা তা'লা তোমাদের যাবতীয় ঘাটতি পুষিয়ে দিবেন। কিন্তু পৃথিবীতে শাসনক্ষমতা ও নেতৃত্বের পুরস্কার এখন তোমরা পাবে না। অর্থাৎ এই ছোট্ট একটি বাক্য দ্বারা আঁ হযরত (সা.) আনসারদের মনে এই শিক্ষা বদ্ধমূল করে দিলেন যে, জাতিগতভাবে শক্তিশালী হতে হলে এবং উন্নতি করতে চাইলে নিজেদের দুর্বল সাথীদেরকেও সযত্নে সঙ্গে করে নিয়ে চল, অন্যথায় একাংশের বোঝা অন্য অংশকেও বহন করতে হবে। এবং এই বাক্য দ্বারা তিনি একথাও ব্যখ্যা করে দিয়েছেন যে, তোমরা যদি আমার সাহচর্য গ্রহণের পরও জাগতিক ভোগবিলাসের মোহে পড়েছ, এখন জাগতিক ভোগবিলাস ত্যাগ করতে হবে। কিন্তু চিন্তাধারার এই প্রবাহের সঙ্গে তৎক্ষণাৎ এই চিন্তার উদ্রেক হয় যেন আনসারদের দল ঐশী নেয়ামত থেকে বঞ্চিত থেকে গেল। সেই কারণে আঁ হযরত (সা.) সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রান্তি দূর করে দিয়েছিলেন এবং স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে, এমনটি মোটেই নয়, খোদা তাদেরকে পরকালে পুরস্কাররাজির উত্তরাধিকারি করবেন। আর যেহেতু পরকালই প্রকৃত জীবন, তাই পরকালে যদি পুরস্কার পাওয়া যায় তবে জাগতিক ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চিত থাকা নিয়ে কোন অনুযোগ নেই। আঁ হযরত (সা.)-এর এই কথার মধ্যে আরও সূক্ষ্ম বিষয় লুকিয়ে আছে। যদিও সেই সময় তাঁর অভিপ্রায় ছিল আনসারদের সতর্ক করা, কিন্তু তিনি পুরস্কারের অংশকে স্পষ্ট বাক্যে বর্ণনা করেছেন, কিন্তু শাস্তি ও বঞ্চনার অর্থকে ভাষায় প্রকাশ করেন নি, এর মাঝামাঝি অবস্থানে রেখেছেন। অর্থাৎ তিনি একথা বলেন নি যে, এখন তোমরা আর পৃথিবীতে শাসন ক্ষমতার পুরস্কার লাভ করবে না, বরং 'তোমরা আমার সঙ্গে পরকালে মিলিত হয়ো'- কেবল এতটুকু বলেই নীরব হয়ে গিয়েছেন। কিন্তু যেহেতু এর দ্বারা তাদেরকে ভর্ৎসনাও করা হয়েছিল, তাই তিনি তাদের সামনে একথা প্রকাশ করেন নি যে, পরকালে তারা খোদা তা'লার কাছে বিরাট পুরস্কার লাভ করবে। 'হউজে কাউসার'- এ আমার সঙ্গে সাক্ষাত করো'- তিনি এটুকু বলেই নীরব হয়ে গিয়েছেন। অর্থাৎ সেই 'হউজ ' এ সাক্ষাত করো, যেখানে সকল অসীম পুরস্কার ও অনাবিল সৌন্দর্যের উৎস থেকে তোমরা লাভ করবে। যার মধ্যে এ বিষয়ের প্রতি ইঙ্গিত ছিল যে, জাগতিক ধন-সম্পদ থেকে বঞ্চনা পরকালে পুরস্কারের প্রাচুর্য দ্বারা পুষিয়ে দেওয়া হবে। এ হল আরব মরুভূমির সেই উম্মী নবীর বাণী, জাগতিক জ্ঞানের দৃষ্টিকোণ থেকে দেখলে যিনি এর প্রাথমিক জ্ঞান সম্পর্কেও অনভিজ্ঞ ছিলেন।

আরও একটি ঘটনার দৃষ্টান্ত

খোদা তা'লার ইচ্ছা অনুযায়ী একটি যুদ্ধে মুসলমানদের পরাজয় হয়, অনেক সাহাবা রণে ভঙ্গ দেয়। পরবর্তীতে তাঁরা লজ্জায় আঁ হযরত (সা.)এর সামনে আসতেন না। আঁ হযরত (সা.) তাদেরকে মসজিদের কোণে অন্ধকারে মুখ লুকিয়ে বসে থাকতে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, তোমরা কারা? তাঁরা লজ্জায় মাটিতে মিশে যেতে চাইছিলেন আর কেঁদে কেঁদে বললেন, ' হে রসুলুল্লাহ! আমরা হলাম সেই পলায়নকারীর দল'। তিনি (সা.) প্রায় সঙ্গে সঙ্গে বললেন, না, না, তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শনকারী নও, তোমরা তো পুনরায় আক্রমণের জন্য প্রস্তত হয়ে আছ।" কি অপরূপ তাঁর মহিমা! যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে পলায়নকারী সৈন্যরা অনুশোচনায় নিমজ্জিত, তাঁরা বলছেন, হে রসুলুল্লাহ! আমরা যুদ্ধ ক্ষেত্রে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করেছি, এখন আপনাকে কিভাবে মুখ দেখাব?' তিনি (সা.) দেখলেন, তারা হতোদ্যম হয়ে পড়েছে, তাই তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'কে বলেছে তোমরা পলায়নকারী? তোমরা তো প্রতি আক্রমণের জন্য পিছু হটেছ মাত্র। তোমরা আমার সঙ্গে পুনরায় যুদ্ধে বের হবে। এই ভাবে তিনি (সা.) হতোদ্যম সৈন্যদেরকে ভেঙ্গে যাওয়া মনোবলকে উচ্চতার শিখরে পৌঁছে দিয়েছেন।

(মাজামীনে বশীর, পৃ: ১৯-১৬৫)

মহানবী (সাঃ)-এর ক্ষমাপরায়ণতা

হযরত মির্যা বশীর আহমদ, এম.এ (রা.) রচিত 'সীরাত খাতামান্নাবীঈন' পুস্তক থেকে উদ্ধৃত

আল্লাহ্ তা'লা কুরআন মজীদে বলেন-

خُذِ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ ﴿١٩٩﴾

(হে নবী!) তুমি সদা মার্জনার নীতি অবলম্বন কর এবং ন্যায়-নীতির আদেশ দাও এবং অজ্ঞলোকদিগের নিকট হইতে মুখ ফিরাইয়া লও।

(আরাফ: ২০০)

আল্লাহ্ তা'লার এই নির্দেশ এবং এর মতই আরও একাধিক নির্দেশের আলোকে আমাদের প্রিয় নবী হযরত মহম্মদ (সা.)-এর ক্ষমাপরায়ণতার এমন অতুলনীয় দৃষ্টান্ত উপস্থাপন করেছেন যে নবীগণের ইতিহাসে এমন নজির খুঁজলেও পাওয়া সম্ভব নয়। পৃথিবীতে ক্ষমাপরায়ণতার এমন অসাধারণ দৃষ্টান্ত স্থাপনও যে সম্ভব হয়েছিল আর কোন ব্যক্তি এর এমন উচ্চ মর্যাদায় অধিষ্ঠিত হতে পেরেছিল, এমন কথা একজন সাধারণ ব্যক্তির কল্পনার উর্দ্ধে। ছোট খাট অত্যাচারের কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া হল, তিনি তো বড় বড় হত্যাকারী, অত্যাচার ও বর্বরতা যাবতীয় সীমা লঙ্ঘনকারীদেরও ক্ষমা করেছেন। আঁ হযরত (সা.)-এর ক্ষমাপরায়ণতার কতিপয় ঘটনাবলী নিম্নে বর্ণিত হল।

কুফফার কুরায়েশ এবং মুসলমানদের মাঝে সংঘটিত এক মহান যুদ্ধ ছিল, যে যুদ্ধে কুফফারদের উপর ভয়াবহ বিপর্যয় নেমে আসে, তাদের ৭০ জন সৈন্য বন্দী হয়ে যায়। মুসলমানদের প্রাণের শত্রু ও রক্তপিপাসুদের প্রতি আঁ হযরত (সা.) যে ক্ষমাসুলভ আচরণ করলেন তা প্রশংসনীয়। হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ সাহেব বলেন-

কয়েদিদের মধ্যে সোহেল বিন আমরও ছিল, যে কিনা কুরায়েশ নেতাদের অন্যতম ছিল এবং একজন বাগ্মী এবং কুশল বক্তা ছিল, যে আঁ হযরত (সা.)এর বিরুদ্ধে সাধারণত ভাষণ দিয়ে বেড়াত। বদরের যুদ্ধে সে যখন বন্দী হয়ে হল, তখন হযরত উমর (রা.) আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট নিবেদন করলেন, হে রসুলুল্লাহ্! সোহেল বিন আমর এর সামনের দাঁত গুলি তুলে নেওয়া হোক, যাতে সে আপনার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করতে না পারে। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) -এর তাঁর এই প্রস্তাবটি পছন্দ হল না। তিনি বললেন, উমর! তুমি কি জান, ভবিষ্যতে খোদা তা'লা হয়তো তাকে এমন মর্যাদায় অধিষ্ঠিত করবেন যা প্রশংসনীয় হবে। মক্কা বিজয়ের সময় সোহেল মুসলমান হয়ে যান আর আঁ হযরত (সা.)-এর মৃত্যুর পর দোদুল্যমান ঈমানের মানুষদের রক্ষা করতে ইসলামের সমর্থনে অত্যন্ত প্রভাবসৃষ্টিকারী ভাষণ দেন, যার সুবাদে বহু দোদুল্যমান মানুষ রক্ষা পায়। এই সোহেল সম্পর্কে বর্ণনা করা হয়েছে যে, একবার হযরত উমর (রা.)-এর খিলাফতকালে তিনি এবং আবু সুফিয়ান এবং আরও কয়েকজন মক্কার সর্দার, যারা মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হয়েছিলেন, তারা হযরত উমরের সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আসেন। ঘটনাক্রমে সেই মুহূর্তেই হযরত বেলাল, আম্মার এবং সোহেব ও আরও কয়েকজন সাহাবাও হযরত উমর (রা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে আসেন। এরা সেই সব মানুষ ছিলেন যারা একসময় ক্রীতদাস ছিলেন, অত্যন্ত দারিদ্রের মধ্যে দিন যাপন করতেন। কিন্তু তাঁরাই সর্বপ্রথম ইসলাম গ্রহণকারী মানুষদের মধ্যে ছিলেন। হযরত উমর (রা.)কে সংবাদ দেওয়া হলে তিনি বিলাল ও তাঁর সাথীদের সাক্ষাতের জন্য ডেকে পাঠান। আবু সুফিয়ানের মধ্যে সম্ভবত এখনও অজ্ঞতার যুগের রেশ কিছুটা অবশিষ্ট ছিল, তাই সে যখন এই দৃশ্য দেখল, তার শরীরে যেন আগুন জ্বলে উঠল। সে বলে উঠল, "আমাদেরকে প্রতীক্ষায় রেখে ক্রীতদাসদের সাক্ষাতের সুযোগ দেওয়া হবে, এমন অপমানের জ্বালাও সহ্য করতে হবে বলে কখনও ভাবি নি।" সোহেল তৎক্ষণাৎ তার মুখের উপর উত্তর দিল, 'তবে এর জন্য দায়ী কে? মহম্মদ (সা.) আমাদের সকলকে খোদার দিকে আহ্বান করেছেন, কিন্তু তাঁরা কালক্ষেপ না করেই তাঁকে স্বীকার করেছেন, আর আমরা বিলম্ব করেছি। তবে তাঁরা আমাদের উপর অগ্রাধিকার পাবে বৈকি।

(সীরাত খাতামান্নাবীঈন, পৃ: ৩৬৯)

অনুরূপভাবে উমায়ের বিন ওহাব, যে কিনা আঁ হযরত (সা.)-কে হত্যার উদ্দেশ্যে মক্কা থেকে মদিনায় গিয়েছিল, তার সঙ্গে সদাচারণ এবং তাকে ক্ষমা করার ঘটনা হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এইভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন-

"বদরের যুদ্ধের কয়েকদিন পর উমায়ের বিন ওহাব এবং সাফওয়ান বিন উমাইয়া বিন খালাফ-কুরায়েশদের এই কয়েকজন প্রভাবশালী নেতারা কাবার প্রাঙ্গনে বসে বদরে নিহতদের নিয়ে শোক পালন করছিল। হঠাৎ করে সাফওয়ান উমায়েরকে সম্বোধন করে বলল, 'এখন আর বেঁচে থাকার কোন আনন্দ নেই।' উমায়ের ইঙ্গিত বুঝতে পেরে উত্তর দিল, 'আমি তো নিজের জীবনের ঝুঁকি নিতে প্রস্তুত, কিন্তু সন্তান-সন্ততি এবং ঋণের চিন্তা আমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াচ্ছে। অন্যথায় মদিনায় গিয়ে চুপিসারে মহম্মদ (সা.)কে শেষ করে দিয়ে আসা খুবই সাধারণ ব্যাপার। সেখানে আমার যাওয়ার অজুহাতও আছে, আমার ছেলে তাদের কাছে বন্দী আছে। ' সাফওয়ান বলল, 'তোমার ঋণ এবং সন্তানদের দায়িত্ব আমি নিচ্ছি, তুমি অবশ্যই যাও, যেভাবেই হোক এই কাজ সমাধা করে এস। ' যাইহোক পরিকল্পনা পাকা করে সে সাফওয়ানের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে উমায়ের নিজের বাড়ি আসে। সেখানে একটি তরবারিকে বিষের মধ্যে ভিজিয়ে নিয়ে মক্কা থেকে বের হয়। সে যখন মদিনায় পৌঁছল, তখন হযরত উমর তাকে দেখে শঙ্কিত হলেন, কেননা তিনি এ সব বিষয়ে অত্যন্ত বিচক্ষণ ছিলেন। তাই তিনি অবিলম্বে আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট গিয়ে নিবেদন করলেন যে উমায়ের এসেছে, আর আমি তার সম্পর্কে মোটেই স্বস্তিতে থাকতে পারছি না। আঁ হযরত (সা.) বললেন, তাকে আমার কাছে নিয়ে এস। হযরত উমর (রা.) তাকে নিয়ে আসার জন্য গেলেন, কিন্তু যাওয়ার পথে কয়েকজন সাহাবাদেরকে বলে গেলেন,'আমি উমায়েরকে আঁ হযরত (সা.)-এর সঙ্গে সাক্ষাতের জন্য আনতে যাচ্ছি, কিন্তু তার গতিবিধি আমার কাছে সন্দেহজনক বলে মনে হচ্ছে। তোমরা আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে গিয়ে বস, একটু সতর্ক থেকো। এরপর হযরত উমর (রা.) উমায়েরকে সঙ্গে নিয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর সমীপে উপস্থিত হলেন। আঁ হযরত (সা.) অত্যন্ত স্নেহ ও ভালবাসা দিয়ে তাকে কাছে বসিয়ে জিজ্ঞাসা করেন, 'উমায়ের বল, কি উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছো? ' উমায়ের বলল, 'আমার ছেলে আপনার হাতে বন্দী আছে, তাকে মুক্ত করে নিয়ে যেতে এসেছি।' আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'তবে এই তরবারিটি কেন রেখেছ?' সে উত্তর দিল, 'আপনি তরবারির কথা কি বলছেন? বদরে তরবারি কি কাজে এসেছিল? ' আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'না, ঠিক করে বলো, কেন এসেছ?' সে বলল, 'আমি বলেই তো দিয়েছি, ছেলেকে বন্দিমুক্ত করতে এসেছি।' আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'তার মানে তুমি সাফওয়ানের সঙ্গে কাবার প্রাঙ্গণে কোন ষড়যন্ত্র কর নি?' উমায়ের থ' হয়ে যায়। কিন্তু নিজেকে সংবরণ করে বলল, 'না,আমি কোন ষড়যন্ত্র করি নি।'

মহানবী (সা.)-এর বাণী

"আপনি নিজে এবং পরিবারের সদস্যগণ এম.টি.এ শোনার বিষয়ে গুরুত্ব দিন, আমার খুতবা এবং বিভিন্ন সময়ে দেওয়া ভাষণগুলি শুনুন।" (২০১৬ সালের ঘানা জলসায় প্রদত্ত বিশেষ বার্তা)

দোয়াপ্রার্থী: Begum Aseya Khatun, Hahari (Murshidabad)

আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'তুমি কি আমাকে হত্যার পরিকল্পনা কর নি? কিন্তু স্মরণ রেখো, খোদা তোমাকে আমার কাছ পর্যন্ত পোঁছনোর সামর্থ দিবেন না।" উমায়ের বেশ চিন্তায় পড়ে গেল, সে বলল, 'আপনি সত্য কথা বলছেন, 'আমরা সত্যিই এই ষড়যন্ত্র করেছিলাম। কিন্তু মনে হচ্ছে খোদা আপনার সঙ্গে আছেন, যিনি আপনাকে আমাদের উদ্দেশ্য সম্পর্কে সংবাদ দিয়েছেন। অন্যথায় যে সময় আমার এবং সাফওয়ানের মধ্যে কথা হয়েছিল, তখন সেখনে কোন তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না। হয়তো খোদা তা'লা আমার ঈমান আনানোর জন্য এমন বন্দোবস্ত করেছেন। আমি সত্য অন্তঃকরণে আপনার উপর ঈমান আনছি।' আঁ হযরত (সা.) তার ঈমান আনায় প্রীত হলেন এবং সাহাবাদের বললেন, 'এখন এ তোমাদের ভাই, একে ইসলামের শিক্ষা সম্পর্কে অবগত কর আর এর বন্দীকে মুক্ত করে দাও।' যাইহোক উমায়ের বিন ওহাব মুসলমান হয়ে যান এবং দ্রুত তিনি ঈমান ও নিষ্ঠায় চোখে পড়ার মত উন্নতি লাভ করেন। অবশেষে সত্যের জ্যোতি দ্বারা এতটাই মুগ্ধ হন যে আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে তাকে মক্কায় পাঠানোর জন্য পীড়াপীড়ি করতেন যাতে সেখানে তবলীগ করতে পারেন। আঁ হযরত (সা.) তাকে অনুমতি দেন, আর তিনি মক্কায় পোঁছে প্রবল উৎসাহে বেশ কয়েক জনকে গোপনে মুসলমান বানান। এদিকে সাফওয়ান আঁ হযরত (সা.)-এর হত্যার সংবাদ শোনার প্রতীক্ষায় দিন রাত অস্থির হয়েছিল। সে কুরায়েশদের বলে বেড়াত, এখন তোমরা সুসংবাদ শোনার জন্য প্রস্তুত হও। সে যখন এই দৃশ্য দেখল,তখন তার বিস্ময়ের আর সীমা রইল না।"

আহযাবের যুদ্ধ ৫ হিজরীতে সংঘটিত হয়েছিল। কুফফারদের সৈন্যের সংখ্যা ছিল প্রায় কুড়ি হাজার, যেন সমগ্র আরব মদিনায় চড়াও করতে এসেছিল। যুদ্ধ এতটাই ভয়াবহ ছিল যে এর তীব্রতা ও কঠোরতার চিত্র কুরআন করীম একটি বাক্যে এঁকে দিয়েছে।

إِذْ جَآءُوكُم مِّن فَوْقِكُمْ وَمِنْ أَسْفَلَ مِنكُمْ وَإِذْ زَاغَتِ الْأَبْصَارُ وَبَلَغَتِ الْقُلُوبُ الْحَنَاجِرَ وَتَظُنُّونَ بِاللَّهِ الظُّنُونَا۠ هُنَالِكَ ابْتُلِيَ الْمُؤْمِنُونَ وَزُلْزِلُوا زِلْزَالًا شَدِيدًا (احزاب:11،12)

অনুবাদ: যখন তাহারা তোমাদের উর্ধ্বদেশ হইতেও এবং তোমাদের নিম্নদেশ হইতেও তোমাদের উপর চড়াও করিয়া আসিয়াছিল, এবং (তোমাদের) চক্ষুগুলি আতঙ্কে বিস্ফারিত হইয়া গিয়াছিল এবং প্রাণসমূহ (ত্রাসে) কণ্ঠাগত হইয়া গিয়াছিল এবং আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা নানাবিধ ধারণা পোষণ করিতেছিলে, তখন মোমেনগণকে এক ভয়ঙ্কর পরীক্ষায় ফেলা হইয়াছিল এবং তাহারা ভীষণভাবে প্রকম্পিত হইয়াছিল।

(আল আহযাব: ১১,১২)

এমন বিপদের সময় আর ভয়াবহ কঠিন পরিস্থিতিতে বনু কুরাইযা বিশ্বাসঘাতকতা করল, মুসলমানদের সঙ্গে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে তারা কুফফারদের সঙ্গ দিল। তাদের বিশ্বাসঘাতকতার কারণে আঁ হযরত (সা.)-এর নির্দেশে তাদের দুর্গ ঘেরাও করা হয়। বনু কুরাইযা আত্মসমর্পণ করে। তারা যদি আঁ হযরত (সা.)-এর সিদ্ধান্ত মেনে নিত, তবে নিশ্চয় তাদের প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হত, কিন্তু তারা সাআদ বিন মাআয এর সিদ্ধান্ত মানার উপর জেদ ধরল। সাআদ বিন মাআয তওরাতের শিক্ষা অনুসারে তাদের যুদ্ধবাজ পুরুষদেরকে হত্যা করার সিদ্ধান্ত প্রদান করেন যা ক্রিয়ান্বিত হয়। এখানে আঁ হযরত (সা.)-এর ক্ষমাপরায়ণতার ঘটনা বর্ণনা করে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব লেখেন-

'যুবায়ের বিন বাতিয়া নামে এক ব্যক্তি বনু কুরাইযদের সর্দার ছিল। সে সাবিত বিন কায়েস নামক এক মুসলমান ব্যক্তির উপর কোনও কালে অনুগ্রহ করেছিল। সাবিত আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট তাকে মুক্তি দেওয়ার বিষয়ে সুপারিশ করেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'বেশ! তাকে ছেড়ে দাও।' সাবিত যুবায়েরকে গিয়ে সুসংবাদ জানিয়ে বলে আঁ হযরত (সা.) তোমাকে আমার সুপারিশে মুক্তি দিয়েছেন। যুবায়ের বলল, আমার স্ত্রী সন্তানেরা তো বন্দী রয়েছে, আমি হত্যা থেকে রক্ষা পেয়ে কি করব? সাবিত পুনরায় আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট গিয়ে যুবেরের বক্তব্য তুলে ধরলেন। আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'তার স্ত্রী সন্তানকেও মুক্ত করে দাও।' সাবিত গিয়ে তাকে সুসংবাদ দিল, যা শুনে সে বলল, 'আমার সম্পদ তো সব মুসলমানদের আয়ত্বে চলে গিয়েছে। আমি শুধু স্ত্রী সন্তানদের নিয়ে কি করব? সাবিত আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট নিবেদন করলে আঁ হযরত (সা.) যুবায়েরের সম্পদও ফিরিয়ে দেওয়ার আদেশ দেন। এবার সাবিত আনন্দ সহকারে যুবায়েরের কাছে গিয়ে বলল, নাও এখন তোমার সম্পদও তুমি ফিরে পাবে। সে বলল, আমাদের নেতা কাআব বিন আসাদ এবং আরবের ইহুদীদের নেতা হাঈ বিন আখতাব কেমন আছেন? সাবিত বলল, তাকে তো হত্যা করা হয়েছে। সে বলল, যদি এরা নিহত হয়, তবে আমি বেঁচে থেকে কি করব। তাই সে হত্যা করার স্থানে গিয়ে তরবারির সামনে নিজের মাথা পেতে দেয়।

রিফা নামে আরও এক ইহুদী ছিল সে একজন মুসলমান মহিলাকে পীড়াপীড়ি করে নিজের সুপারিশের জন্য দাঁড় করায়। আঁ হযরত (সা.) সেই মুসলিম মহিলার সুপারিশে রিফাকেও ক্ষমা করে দেন। মোটকথা সেই সময় যার নামেই সুপারিশ করা হয়েছে, তাকেই তৎক্ষণাৎ ক্ষমা করে দেওয়া হয়েছে। যা থেকে প্রমাণ হয় যে তিনি (সা.) সাআদ (রা.)-এর সিদ্ধান্তের কারণে নিরুপায় ছিলেন, অন্যথায় তাদের হত্যার সিদ্ধান্তে তাঁর মন সরছিল না।

(পৃ: ৬০২)

সুমামা বিন উসাল-কে ক্ষমা করার ঘটনা বর্ণনা করতে গিয়ে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব এম.এ বলেন-

৬ষ্ঠ হিজরী সনের ঠিক প্রারম্ভে এবং চন্দ্র বছরের প্রথম মাস অর্থাৎ মহররম-এর প্রারম্ভে আঁ হযরত (সা.) নাজাদবাসীর পক্ষ থেকে বিপদ সংবাদ পান। বিপদের আশঙ্কার কথা কুরতা গোত্রের পক্ষ থেকে ছিল, যারা বনু বাকার গোত্রের একটি শাখা ছিল আর মদিনা থেকে সাত দিনের দূরত্বে অবস্থিত নাজাদ অঞ্চলের জারিয়াবাদে বসবাস করত। এই সংবাদ পাওয়া মাত্র আঁ হযরত (সা.) কালক্ষেপ না করে তাঁর এক সাহাবী মহম্মদ বিন মুসলেমা আনসারির নেতৃত্বে ত্রিশজন অশ্বারোহীর ছোট্ট একটি দলকে নাজাদের দিকে রওনা করেন। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা কুফফারদের মনে এমন ত্রাসের সঞ্চার করলেন যে তারা সামান্য একটু যুদ্ধের পর পিছু হটে। তৎকালীন যুদ্ধ প্রথা অনুসারে যদিও মুসলমানদের কাছে প্রতিপক্ষের মহিলা ও শিশুদের বন্দী বানানোর সুযোগ ছিল, কেননা শত্রুরা তাদেরকে ছেড়ে পালিয়েছিল। কিন্তু মহম্মদ বিন মুসলেমা মহিলা এবং শিশুদেরকে আটক করেন নি, তিনি উট ও ছাগল সহ যুদ্ধলবন্ধ সাধারণ জিনিস পত্র নিয়ে মদিনা ফিরে আসেন।

এই অভিযান থেকে ফিরে আসার পর সুমামা বিন উসাল-এর বন্দী হওয়ার ঘটনা ঘটে। উক্ত ব্যক্তি ইয়মামার অধিবাসী ছিল এবং বনু হানীফা গোত্রের একজন অত্যন্ত প্রভাবশালী নেতা ছিল। ইসলামের শত্রুতায় এতটাই অন্ধ ছিল যে সব সময় নিরপরাধ মুসলমানদেরকে হত্যার জন্য উন্মুখ হয়ে থাকত। একবার আঁ হযরত (সা.)-এর এক দূত তার এলাকায় গেলে সে যুদ্ধের যাবতীয় নিয়ম-নীতি বিসর্জন দিয়ে তাকে হত্যার ষড়যন্ত্র রচনা করে। এমনকি একবার সে আঁ হযরত (সা.)-কেও হত্যার সংকল্প করে। মহম্মদ বিন মুসলেমার দল যখন সুমামাকে বন্দী করে নিয়ে আসে, তখন তিনি জানতেন না যে এই ব্যক্তি কে? তিনি তাকে সন্দেহের বশে বন্দী করেছিলেন। আর এর দ্বারা বোঝা যায় যে সুমামাও ভীষণ চতুরতার সঙ্গে নিজের পরিচয় লুকিয়ে রাখে। কারণ সে যে ইসলামের বিরুদ্ধে ভয়ানক অপরাধ করেছে আর ইসলামের এই সব আত্মাভিমানি সৈন্যরা যদি তার পরিচয় জেনে ফেলে, তবে তারা

ইমামের বাণী

"খিলাফতের সঙ্গে দৃঢ় সম্পর্ক স্থাপনের জন্য প্রত্যেক আহমদীকে এম.টি.এ শোনা দরকার, এর অভ্যাস গড়ে তোলা দরকার।" (খুতবা জুমা, প্রদত্ত ৪ঠা মার্চ, ২০১৬)

দোয়াপ্রার্থী: Mohmmad Parvez Hossain and Family, Bolpur, (Birbhum)

হয়তো তার সঙ্গে কঠোরতা করবে কিম্বা তাকে হত্যা করে ফেলবে, একথা সে জানত। কিন্তু সে নিজে আঁ হযরত (সা.)-এর পক্ষ থেকে উত্তম আচরণের প্রত্যাশা রাখত। সেই কারণেই মহম্মদ বিন মুসলেমার দল মদিনা ফিরে আসা পর্যন্ত সুমামা নিজের পরিচয় গোপন রাখে।

মদিনা পৌঁছে সুমামাকে যখন আঁ হযরত (সা.)-এর সামনে নিয়ে আসা হল, তিনি তখন তাকে দেখেই চিনে ফেললেন আর মহম্মদ বিন মুসলেমা এবং তাঁর সঙ্গীদেরকে বললেন, তোমরা কি জান এই ব্যক্তি কে? তারা উত্তর দিল, 'না'। এরপর আঁ হযরত (সা.) তাদের কাছে সুমামার ঘটনা তুলে ধরলেন। এরপর রীতি মত আঁ হযরত (সা.) সুমামার সঙ্গে উত্তম আচরণ করার নির্দেশ দিলেন এবং বাড়ির ভিতরে গিয়ে বললেন খাওয়ার জন্য যা কিছু প্রস্তুত আছে তা সুমামার জন্য বাইরে পাঠিয়ে দাও। সেই সঙ্গে তিনি সাহাবাদের বললেন, সুমামাকে অন্য কারো বাড়িতে না রেখে মসজিদ নববীর প্রাঙ্গণেই কোনও স্তম্ভের সঙ্গে বেঁধে বন্দি করে রাখা হোক। এর পিছনে আঁ হযরত (সা.)-এর উদ্দেশ্য ছিল তাঁর মজলিস এবং মুসলমানদের নামায যেন সুমামার চোখের সামনে সংঘটিত হয় আর এই সব আধ্যাত্মিক দৃশ্যে প্রভাবিত হয়ে সে ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়।

সেই দিনগুলিতে আঁ হযরত (সা.) প্রতিদিন সকালে সুমামার কাছে এসে তার খোঁজখবর নেওয়ার পর জিজ্ঞাসা করতেন- 'সুমামা! বল, এখন তোমার পরিকল্পনা কি?" সুমামা উত্তর দিত, "হে মুহম্মদ (সা.)! আপনি যদি আমাকে হত্যা করেন, তবে এটা আপনার অধিকার বর্তায়। কেননা আমার বিরুদ্ধে খুনের অভিযোগ আছে। কিন্তু যদি আপনি আমার উপর অনুগ্রহ করেন, তবে দেখবেন, আপনি কৃতজ্ঞতা প্রকাশে কোন কার্পণ্য করব না। আপনি যদি মুক্তিপণ নিতে চান, তবে আমি মুক্তিপণ দিতেও প্রস্তুত।" তিন দিন পর্যন্ত এভাবেই প্রশ্নোত্তর চলতে থাকে। অবশেষে তৃতীয় দিন আঁ হযরত (সা.) নিজে থেকেই সাহাবাদের নির্দেশ দিলেন, 'সুমামার বাঁধন খুলে ওকে মুক্ত করে দাও।' সাহাবারা অবিলম্বে তাকে মুক্তি দিলেন আর সুমামা দ্রুত মসজিদ থেকে বেরিয়ে বাইরে চলে গেল। সম্ভবত সাহাবাদের ধারণা ছিল যে সে এখন নিজের দেশে ফিরে যাবে। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) বুঝে গিয়েছিলেন যে তিনি সুমামার মন জয় করে ফেলেছেন। সুমামা অদূরের একটি বাগানে গিয়ে সেখানে স্নান করে ফিরে এল। ফিরে এসেই সে আঁ হযরত (সা.)-এর হাতে মুসলমান হয়ে গেল। এরপর সে আঁ হযরত (সা.)-এর কাছে নিবেদন করল,'হে রসুলুল্লাহ্! এক সময় ছিল যখন আমি সারা পৃথিবীতে আপনাকে, আপনার ধর্মকে এবং আপনার শহরকে সব থেকে বেশি অপছন্দ করতাম। কিন্তু এখন আপনি, আপনার ধর্ম এবং আপনার শহর আমার কাছে সব থেকে বেশি প্রিয়।"

সেই দিন সন্ধ্যায় যখন যথারীতি তার জন্য খাবার নিয়ে আসা হল, তখন সে সামান্য খেয়ে বাকিটুকু উচ্ছিষ্ট রেখে দিল। যা দেখে সাহাবারা বিস্মিত হলেন যে, আজ সকাল পর্যন্ত সে প্রচুর পরিমাণে খেতে থেকেছে, তাকে পেটুকই বলা যায়। কিন্তু এখন সে যৎ সামান্যই খেল। আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট এই সংবাদ পৌঁছলে তিনি বললেন, 'সকাল পর্যন্ত সে কাফেরদের মত খাবার খেত, এখন একজন মুসলমানের মত খেয়েছে।' তিনি এর আরও বিশদ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে বলেন- 'কাফের সাতটি পেটে খায়, আর মুসলমান কেবল একটি পেটে খায়। এর দ্বারা তিনি বোঝাতে চেয়েছিলেন যে কাফের যেমন পার্থিব ভোগ বিলাসে নিমগ্ন থাকে, ঠিক তার বিপরীতে একজন সত্যিকার মুসলমান নিজের দৈহিক চাহিদাবলীকে ততটুকুর মধ্যেই সীমাবদ্ধ রাখে যতটুকু জীবন ধারণের জন্য আবশ্যক। কেননা একজন সত্যিকার মুসলমান ধর্মের মধ্যেই প্রকৃত আনন্দ খুঁজে পায়। একথাও স্মরণ রাখা উচিত, এখানে সাতটি সংখ্যা দ্বারা কোন নির্দিষ্ট মাত্রাকে বোঝানো হয় নি, আরবী প্রবাদ অনুসারে সাত সংখ্যা অত্যধিক এবং পূর্ণতা বোঝাতেও ব্যবহৃত হয়। অর্থাৎ বোঝানো হয়েছে যে একজন কাফের জাগতিক ভোগ বিলাসে নিমগ্ন থাকে, তার সকল মনোযোগ জাগতিকতায় নিবদ্ধ থাকে। কিন্তু একজন মোমিন নিজেকে জাগতিক ভোগ বিলাস থেকে বিরত রাখে এবং অত্যাবশ্যক চাহিদার সীমা ছাড়ায় না। কেননা তার প্রকৃত আনন্দের জগতটাই আলাদা। এই শিক্ষা আঁহযরত (সা.)-এর প্রকৃতির মধ্যে ছিল, যেটি তাঁর ব্যক্তি চরিত্রে সুস্পষ্টভাবে প্রতিফলিত হয়েছে।

মুসলমান হওয়ার পর সুমামা আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট নিবেদন করে, 'হে রসুলুল্লাহ্! যখন আপনার লোকেরা আমাকে বন্দী করেছিল, তখন আমি খানা কাবায় উমরার উদ্দেশ্যে যাচ্ছিলাম। এখন আপনি আমাকে কি আদেশ করেন? আঁ হযরত (সা.) সুমামাকে অনুমতি প্রদান করেন তার জন্য দোয়া করেন এবং সে মক্কার দিকে রওনা হয়ে যায়। সেখানে পৌঁছে সুমামা ঈমানের উৎসাহে কুরায়েশদের মধ্যে প্রকাশ্যে তবলীগ শুরু করে দেয়। এমন দৃশ্য দেখে কুরায়েশদের চোখ রক্ত বর্ণ ধারণ করে, তারা সুমামাকে ধরে হত্যা করতে মনস্থির করে। কিন্তু সুমামা যেহেতু ইমামার নেতা ছিল আর ইমামার সঙ্গে মক্কার ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল, তাই তারা এমন পরিকল্পনা থেকে সরে এল, সুমামাকে শুধু গালমন্দ করেই ছেড়ে দিল। কিন্তু সুমামা ভীষণ আবেগ প্রবণ ছিল, আঁ হযরত(সা.) এবং তাঁর সঙ্গীদের উপর কুরায়েশদের করা অত্যাচারের দৃশ্যগুলি তার চোখের সামনেই ছিল। সে মক্কা থেকে যাওয়ার সময় কুরায়েশদের বলল,'খোদার নামে শপথ করে বলছি, ভবিষ্যতে ইমামা থেকে তোমাদের জন্য একটি শস্যদানা পর্যন্ত পৌঁছবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর অনুমতি দেন।

দেশে ফিরে সত্যি সত্যিই ইমামা থেকে মক্কার দিকে রওনা হওয়া বাণিজ্যিক দলগুলির গতিপথ আটকে দেয়। মক্কার জন্য প্রয়োজনীয় খাদ্য ইমামা থেকেই আমদানি করা হত, তাই বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যাওয়ায় কুরায়েশরা কঠিন বিপদের মধ্যে পড়ে যায়। কিছু কাল অতিবাহিত হতে না হতেই কুরায়েশরা উদ্বিগ্ন হয়ে আঁ হযরত (সা.)কে এই মর্মে পত্র লেখে যে, 'আপনি সব সময় আত্মীয়তার বন্ধন রক্ষা করার আদেশ দিয়ে থাকেন, আর আপনার সঙ্গে আমাদের ভ্রাতৃত্বের বন্ধ আছে, রক্তের সম্পর্ক আছে। অতএব, আপনি আমাদেরকে এই বিপদ থেকে উদ্ধার করুন। সেই সময় কুরায়েশরা এতটাই উৎকণ্ঠিত ছিল, যে কেবল চিঠি দিয়ে ক্ষান্ত হয় নি, তারা নিজেদের নেতা আবু সুফিয়ান বিন হারবকেও আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট প্রেরণ করে, যে কিনা আঁ হযরত (সা.)-এর নিকট এসে মৌখিকভাবে অনেক অনুনয় বিনয় করে আর নিজেদের বিপদের কথা উল্লেখ করে অনুগ্রহ যাচনা করে। এরফলে আঁ হযরত (সা.) সুমামা বিন উসালকে নির্দেশ পাঠান যে মক্কাবাসীদের জন্য খাদ্যশস্যের বাণিজ্যিক দলকে যেন না আটকানো হয়। কাজেই পুনরায় বাণিজ্য আরম্ভ হয় আর এই রূপে মক্কাবাসী বিপদ থেকে রক্ষা পায়। এই ঘটনাটি আঁ হযরত (সা.)-এর অতুলনীয় স্নেহ, করুনা ও ক্ষমাপরায়ণতার সুস্পষ্ট প্রমাণ।(৬৬২)

একবার আবু সুফিয়ান আঁ হযরত (সা.)-কে হত্যার ষড়যন্ত্র রচনা করে। এক আরব বেদুইনকে সে তাঁকে হত্যার উদ্দেশ্যে পাঠায়। আঁ হযরত (সা.)-কে রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ্ তা'লা করেছিলেন। হাজার হাজার বার ষড়যন্ত্র করা হলেও কোনও হত্যাকারী কিভাবে তাঁর কাছে পৌঁছতে পারত? যাইহোক হত্যাকারী ধরা পড়ে যায়, কিন্তু আঁ হযরত (সা.) তাকেও ক্ষমা করে দেন। হযরত মির্যা বশীর আহমদ এম.এ (রা.) লেখেন-

'আহযাবের যুদ্ধে শোচনীয় পরাজয়ের গ্লানি মক্কার কুরায়েশদের মধ্যে অন্তর্দহন সৃষ্টি করেছিল আর স্বাভাবিকভাবেই মক্কার নেতা আবুসুফিয়ানের মনের মধ্যে এই আগুন বেশি করে জ্বলছিল, যে কি না আহযাবের যুদ্ধে চরম অপদস্ত হয়েছিল। কিছু সময় পর্যন্ত আবু সুফিয়ান এই আগুনে ভিতর ভিতর জ্বলতে থাকে, কিন্তু অবশেষে বিষয় এমন জায়গায় গিয়ে দাঁড়াল যে তার ধৈর্যের বাঁধন ভেঙে পড়ল, ক্রমেই তার হৃদয়ের বহ্নিশিখা বের হতে শুরু করল। বস্তুত কুফফারদের সব থেকে বেশি শত্রুতা, বা বলতে

গেলে মূল শত্রুতা ছিল আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি। তাই আবু সুফিয়ান চিন্তা করল, বাহ্যিক পরিকল্পনা যখন কাজে এল না, তখন কোন গোপন ষড়যন্ত্রের মাধ্যমে মহম্মদ (সা.)কে হত্যা করলে মন্দ হয় না। সে জানত যে আঁ হযরত (সা.)-এর চারপাশে তেমন বিশেষ কোন পাহারা থাকে না। অনেক সময় তো তিনি কোন রক্ষী ছাড়াই এদিক সেদিক যাতায়াত করেন, শহরের অলি-গলিতে ঘোরেন, মসজিদে প্রত্যহ কম করে পাঁচ বার নামাযের জন্য আসেন আর সফরকালে একেবারে নিঃসংকোচে ও স্বাধীনভাবে থাকেন। একজন ভাড়াটে খুনির জন্য এর থেকে ভাল সুযোগ আর কি হতে পারত? এই চিন্তা মাথায় আসতেই আবু সুফিয়ান মনে মনে আঁ হযরত (সা.)কে হত্যার পরিকল্পনা পাকা করার ব্যবস্থা শুরু করে দিল।

যখন এ বিষয়ে সে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হল, তখন সে একদিন সুযোগ পেয়ে নিজের মতলবের কয়েকজন কুরায়েশ যুবকদের বলল, 'তোমাদের মধ্যে কি এমন কোন বীরপুরুষ নেই, যে মদিনায় গিয়ে গোপনে মহম্মদ (সা.)এর ভবলীলা সাঙ্গ করে দিতে পারে? তোমরা কি জান, মহম্মদ মদীনার অলিতে গলিতে অবাধে বিচরণ করে।' সেই যুবকেরা একথা শুনে সেখান থেকে প্রস্থান করে। কিছু দিন যেতে না যেতেই এক বেদুইন যুবক আবু সুফিয়ানের কাছে এসে বলল, 'আমি আপনার পরিকল্পনার কথা শুনেছি, আর আমি একাজের জন্য প্রস্তুত আছি। আমি একজন দৃঢ় হৃদয়ের পরিণত ব্যক্তি, যার মুষ্ঠি সুদৃঢ় এবং আক্রমণে ক্ষিপ্র। আপনি যদি এ কাজের জন্য আমাকে নিযুক্ত করে আমার সাহায্য করেন, তবে আমি মহম্মদ (সা.) কে হত্যা করার উদ্দেশ্যে যেতে প্রস্তুত। আমার কাছে একটি এমন ছুরি আছে যা শিকারী বাজপাখির গোপন ডানার মত লুকানো থাকবে। আমি মহম্মদ (সা.)-এর উপর আক্রমণ করব এবং দ্রুত সেখান থেকে পালিয়ে গিয়ে কোন মরুযাত্রীদলের সঙ্গে মিশে যাব। মুসলমানেরা আমাকে ধরতে পারবে না আর আমি মদিনার রাস্তাঘাটও ভাল করে চিনি।' আবু সুফিয়ান বলল, 'এতটুকুই যথেষ্ট, তোমার মত একজনকেই আমরা খুঁজছিলাম।' এরপর আবু সুফিয়ান তাকে একটি দ্রুত গতির উট এবং কিছু পাথেয় দিয়ে বিদায় করল। বিদায়ের পূর্বে একথা ভাল করে স্মরণ করিয়ে দিল যে, এই কথা যেন গোপন থাকে।

মক্কা থেকে বিদায় হয়ে সেই ব্যক্তি দিনের বেলায় লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে রাত্রিতে সফর করতে করতে মদিনার দিকে যাত্রা করল এবং ষষ্ঠ দিনে মদিনায় পৌঁছে আঁ হযরত (সা.)-এর ঠিকানা সংগ্রহ করে সোজা বনী আব্দুল আশহাল গোত্রের মসজিদে গিয়ে উঠল, যেখানে আঁ হযরত (সা.) সেই সময় উপস্থিত ছিলেন। যেহেতু সেই সময় মদিনায় নতুন নতুন মানুষের আনাগোনা ছিল, তাই কোন মুসলমান তাকে সন্দেহ করে নি। কিন্তু আঁ হযরত (সা.) তাকে নিজের দিকে আসতে দেখে বললেন, 'এই ব্যক্তি কোন অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে এসেছে।' এই কথা শোনা মাত্র সে আরও দ্রুত তাঁর দিকে অগ্রসর হল, কিন্তু উসাদ বিন হুযায়ের নামে এক আনসার নেতা অবিলম্বে তাঁর ঝাঁপিয়ে পড়ে। এই ধস্তাধস্তিতে তাঁর হাত সেই ব্যক্তির লুকিয়ে রাখা ছুরির উপর পড়ে, যাতে সে ভীষণ ভয় পেয়ে বলে ওঠে- 'আমার মৃত্যু! আমার মৃত্যু!' যখন তাকে ধরে ফেলা হয়, আঁ হযরত (সা.) তাকে জিজ্ঞাসা করেন, 'সত্যি করে বল, কে তুমি আর কি উদ্দেশ্যে নিয়ে এসেছ?' সে বলল, 'আমার প্রাণ ভিক্ষা দেওয়া হলে আমি বলব। আঁ হযরত (সা.) বললেন, যদি তুমি সব কথা সত্য সত্য বল, তবে তোমাকে ক্ষমা করা হবে। একথা শুনে সে সমস্ত বৃত্তান্ত অবিকল শুনিয়ে দিল আর আবু সুফিয়ান কি পরিমাণ পুরস্কার দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে, সেকথাও জানিয়ে দিল। এরপর সেই ব্যক্তি মদিনাতে কিছু দিন অবস্থান করে এবং স্বেচ্ছায় মুসলমান হয়ে আঁ হযরত (সা.)-এর সেবায় নিয়োজিত হয়।'

এক ইহুদী মহিলা আঁ হযরত (সা.)এর প্রতি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করত। খয়বরের যুদ্ধের সময় সেই মহিলা আঁ হযরত (সা.) কে বিষ প্রয়োগে হত্যা করতে চেয়েছিল। এর ফলে তাঁর এক সাহাবীর মৃত্যুও ঘটে। আঁ হযরত (সা.) তবু তার কাছে কোন প্রতিশোধ গ্রহণ করেন নি, তাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। সৈয়্যদানা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

তৃতীয় ঘটনাটি হল, একটি ইহুদী স্ত্রী লোক সাহাবাদের কাছে জিজ্ঞেস করল যে, রসুল করীম (সা.) পশুর কোন অংশের মাংস খেতে বেশী পছন্দ করেন। সাহাবা বললেন, তিনি গর্দানের মাংশ বেশি পছন্দ করেন। অতঃপর, স্ত্রীলোকটি একটি ছাগল জবেহ করে তার মাংস দিয়ে তপ্ত পাথরে উপর কাবাব তৈরী করল এবং তাতে তীব্র বিষ মিশিয়ে দিল। বিশেষ করে সেই সব কাবাবে যা সে তৈরী করেছিল গর্দানের মাংস দিয়ে, যা রসুলুল্লাহ্ (সা.) পছন্দ করতেন বেশি। সূর্যাস্তের পর মগরিবের নামায পড়ে যখন রসুলুল্লাহ (সা.) তাঁর তাঁবুতে ফিরে আসছিলেন, তখন তিনি দেখতে পেলেন যে, তাঁর খাবারের পাশে একজন স্ত্রী লোক বসে আছে। তাতে তিনি জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের জন্য বসে আছ?' সে বলল, 'আবুল কাসেম, আমি আপনার জন্য কিছু উপহার নিয়ে এসেছি।' রসুল করীম (সা.) জনৈক সাহাবীকে বললেন, 'ও যা দিতে চায় নিয়ে নাও।' অতঃপর, তিনি যখন খেতে বসলেন, তখন খাবারের সঙ্গে ঐ ক্বীমা করা মাংসের কাবাবও রাখা হল। রসুল করীম (সা.) তা থেকে এক গ্রাস মুখে দিলেন। তিনি (সা.) তৎক্ষণাৎ বললেন, 'খেয়ো না। এই হাত আমাকে বলে দিয়েছে যে, ঐ মাংসে বিষ মেশানো আছে।' (এর অর্থ এই নয় যে, এ ব্যাপারে তাঁর প্রতি কোন ইলহাম হয়েছিল। বরং এটা একটা আরবী বাগধারা, যার অর্থ হল, মাংস চেখে দেখেই আমি বুঝেছি যে, এর মধ্যে বিষ মেশানো আছে। যেমন, অনুরূপ অর্থে, কোরআন করীমে হযরত মূসা (আ.) এর যুগের এক ঘটনার বর্ণনা প্রসঙ্গে একটি দেওয়াল সম্পকে বলা হয়েছে যে, সেটি পড়ে যেতে চাচ্ছে। যার অর্থ, দেওয়ালটির মধ্যে পড়ে যাওয়ার অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে। কাজেই, এখানেও তাঁর (সা.) ঐ কথা বলার উদ্দেশ্য এটা ছিল না যে, আসলে হাত কথা বলছে। বরং এর তাৎপর্য এটাই ছিল যে, মাংসের স্বাদ দেখে তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, ওতে বিষ আাছে। এর পরবর্তী ঘটনায় সেটা প্রমাণিত হয়েছে। তখন, বশীর (রা.) বললেন, যে খোদা আপনাকে ইজ্জত দান করেছেন, সেই খোদার কসম খেয়ে বলছি, আমিও এক গ্রাস মুখে দিয়ে বুঝতে পেরেছি যে, এতে বিষ আছে। আমি চাচ্ছিলাম যে, আমি এগুলি মুখ থেকে উগলে ফেলি। কিন্তু আমার মনে হলে, তাতে আপনার অসুবিধা হবে, এবং আপনার খাওয়াই নষ্ট হয়ে যাবে। কিন্তু, আপনি যখন মুখে দেওয়া গ্রাস বের করলেন, তখন আপনার দেখাদেখি আমিও বের করে ফেললাম। যেহেতু আমার সন্দেহ হচ্ছিল, এতে বিষ আছে সেহেতু আমি ভয় পাচ্ছিলাম যে, হায়! যদি এমন হয় যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) ঐ লোকমা মুখ থেকে বের না করেন! এর অল্পক্ষণ পরেই বশীর (রা.) অসুস্থ হয়ে পড়েন। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তিনি (রা.) সেখানে খায়বারেই মারা যান, এবং কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, তিনি বেশ কয়েকদিন অসুস্থ থাকার পর মারা যান। এরপর রসুলে করীম (সা.) ঐ মাংসের কিছুটা একটি কুকুরের সামনে ফেলে দিলেন, কুকুরটি মাংস খেয়ে মারা গেল। তখন, রসুলুল্লাহ্ (সা.) সেই মহিলাকে ডেকে পাঠালেন। সে এলে তাকে বললেন, 'তুমি কি এই মাংসে বিষ মিশিয়েছিলে? মহিলাটি উত্তর দিল, 'কে বলেছে আপনাকে একথা?' তিনি বললেন, 'এই হাত আমাকে বলেছে একথা।' এতে মহিলাটি বুঝতে পারল যে, ব্যাপারটা ধরা পড়েছে তাঁর কাছে। এবং সে স্বীকার করল যে, সে বিষ মিশিয়েছে। তিনি তাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'কিসের জন্য তুমি এই জঘন্য কাজ করলে?' উত্তরে সে বলল, 'আমার জাতির সঙ্গে আপনার যুদ্ধ হয়েছে, এবং আমার আত্মীয়-স্বজনরা এই যুদ্ধে নিহত হয়েছে। তাই আমার মনে এই চিন্তার উদয় হলো যে, আমি তাকে বিষ খাওয়াব। যদি তার কাজকর্ম লৌকিক হয়ে থাকে, তাহলে আমরা মুক্তি লাভ করব। আর যদি সে সত্যি সত্যি নবী হয়ে থাকে, তাহলে খোদা তা'লা তাঁকে রক্ষা করবেন।' তার কথা শুনে রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাকে ক্ষমা

ইমামের বাণী

সেই ব্যক্তিকে খোদা তা'লা কখনও বিনষ্ট করেন না, যে কেবল তাঁর সত্তায় বিলীন হয়ে যায়। বরং এমন ব্যক্তির জন্য তিনি স্বয়ং অভিভাবক হয়ে ওঠেন।" (মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯৫)

দোয়াপ্রার্থী: Sabina Yasmin, Bilaspur (Chhattisgarh)

করে দিলেন। এবং এজন্য তার প্রাপ্য মৃত্যুদণ্ড থেকে রেহাই দিলেন। এই ঘটনা থেকে স্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয় যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) তাঁকে এবং তাঁর সাহাবাদেরকে হত্যার চেষ্টার অপরাধে অপরাধী ব্যক্তিদেরকেও ক্ষেত্রবিশেষে ক্ষমা করে দিতেন। অবশ্য প্রয়োজনে তিনি শাস্তিও দিতেন, যখন দেখতেন যে ,এরূপ গুরুতর অপরাধী ব্যক্তিকে জীবিত ছেড়ে দেওয়ার অর্থই হবে আগামীতে তার দ্বারা আরও বেশি ফেৎনা সৃষ্টি হওয়ার সুযোগ করে দেওয়া।

(নবীয়োঁ কা সরদার, পৃ: ১৯৩)

মক্কা বিজয়ের সময় আঁ হযরত (সা.) কিভাবে নিজের, নিজ সাহাবা এবং আত্মীয় স্বজনদের ক্ষমা করেছিলেন তা কারো কাছে গোপন নয়। এই প্রসঙ্গে দুটি ঘটনা হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.)-এর লেখনী থেকে উপস্থাপন করা হচ্ছে। হযরত মুসলেহ মওউদ (রা.) বলেন-

"যে কয়েকজন লোক সম্পর্কে রসুলুল্লাহ্ (সা.) রায় দিয়েছিলেন যে, তাদের অত্যাচারমূলক হত্যাকাণ্ড এবং নানাবিধ জুলুম ও নির্যাতনের অপরাধের দরুন তাদেরকে মৃত্যুদণ্ড দিতে হবে, তাদেরকেও অনেককেই তিনি কোন কোন মুসলমানদের সুপারিশের কারণে ক্ষমা করেদিয়েছিলেন। ক্ষমাপ্রাপ্তদের মধ্যে একজন ছিল আবু জাহলের পুত্র ইকরামা। ইকরামার স্ত্রী মনে মনে মুসলমান হয়েছিল। সে রসুলুল্লাহ্ (সা.) এর কাছে আবেদন করল, 'হে রসুলুল্লাহ্! ইকরামাকেও কি আপনি ক্ষমা করে দিয়েছেন? রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'হ্যাঁ, আমি ওকে ক্ষমা করে দিয়েছি।।

ইকরামা তখন ইয়েমেনের দিকে পালিয়ে যাচ্ছিল। তার স্ত্রী তার প্রতি ভালবাসার টাসে তার পিছনে তাঁর খোঁজে বের হল। যখন সে সমুদ্রগামী জাহাজে উঠে পড়েছে এবং আরবকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে চলে যাচ্ছে, তখন পলাতক সেই সর্দারের স্ত্রী উদ্বিগ্ন হয়ে তার নিকট পৌঁছল এবং বলল,'হে আমার চাচার পুত্র! (আরব স্ত্রীলোকেরা তাদের স্বামীদেরকে চাচার পুত্র বলে সম্বোধন করত)। তুমি অত ভাল এবং অত দয়ালু মানুষটিকে ছেড়ে কোথায় যাচ্ছ?' ইকরামা বিস্মিত হয়ে তার স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করল, 'বলো কি? আমার এতসব শত্রুতার পরেও কি মুহাম্মদ (সা.) আমাকে ক্ষমা করে দিবেন? ইকরামার স্ত্রী বললো, 'হ্যাঁ আমি তাঁর কাছ থেকে প্রতিশ্রুতি নিয়েছি এবং তিনি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন।' সে যখন ফিরে এসে রসুলুল্লাহ্ (সা.)-এর কাছে উপস্থিত হয়ে নিবেদন করল,'হে রসুলুল্লাহ! আমার স্ত্রী বলছে যে, আপনি নাকি আমার মত একটা লোককে ক্ষমা করে দিয়েছেন? ' আঁ হযরত (সা.) বললেন, ' তোমার স্ত্রী ঠিকই বলেছে। আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিয়েছে।'

ইকরামা বলে উঠল,' যে ব্যক্তি এমন ঘোর শত্রুকে ক্ষমা করতে পারে, সে কখনও মিথ্যা হতে পারে না। আমি আরও সাক্ষ্যদান করছি, হে মহম্মদ (সা.)! তুমি তাঁর বান্দা ও তাঁর রসুল। অতঃপর, সে লজ্জায় এত বেশী মাথা নীচু করে ফেলল যে, রসুলুল্লাহ্ (সা.) তার এই লজ্জিত অবস্থা দেখে তাকে স্বান্ত্বনা দেওয়ার জন্য বললেন,' ইকরামা আমি শুধু তোমাকে ক্ষমাই করছি না, তুমি আজ আমার কাছে যা চাইবে, আমি তাই তোমাকে দিব, যদি তা দেওয়ার ক্ষমতা আমার থাকে।'

ইকরামা বললেন, 'হে রসুলুল্লাহ! এর বেশী আমি কি চাইতে পারি। আপনি আল্লাহ্ তা'লার কাছে দোয়া করুন, আমি যে শত্রুতা করেছি আপনার সাথে , তা যেন আল্লাহ্ ক্ষমা করে দেন। রসুলুল্লাহ (সা.) আল্লাহ্ কে সম্বোধন করে বললেন, 'হে আমার আল্লাহ্! সেই সমস্ত শত্রুতা যা ইকরামা আমার বিরুদ্ধে করেছে, তা তুমি ক্ষমা করে দাও এবং যে সমস্ত গালমন্দ তার মুখ থেকে বের হয়েছিল, তার জন্যেও তুমি তাকে ক্ষমা করে দাও।' এরপর রসুলুল্লাহ্ (সা.) উঠলেন এবং তাঁর নিজের গায়ের চাদর নিয়ে তা ইকরামার গায়ে জড়িয়ে দিয়ে বললেন, 'যখন, কোন ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ঈমান এনে আমার কাছে চায় তখন আমার ঘর তার ঘর হয়ে যায় এবং আমার জায়গা তার জায়গা হয়ে যায়।

যে কয়কজন লোকের মৃত্যুদণ্ডের আদেশ হয়েছিল, তাদের মধ্যে সেই ব্যক্তিও ছিল যে রসুলে করীম (সা.)-এর মেয়ে হযরত জয়নব (রা.)-এর মর্মান্তিক মৃত্যুর জন্য দায়ী ছিল। ঐ ব্যক্তির নাম ছিল হাব্বার। সে হযরত জয়নবের (রা.) উটের বেল্ট কেটে দিয়েছিল। ফলে তিনি উটের পিঠ থেকে নীচে পড়ে গিয়েছিলেন এবং তাতে তাঁর গর্ভপাত ঘটেছিল যার ফলে দিন কয়েকের মধ্যেই তাঁর মৃত্যু হয়েছিল। এছাড়াও সে আরও অনেক মৃত্যুদণ্ডযোগ্য অপরাধ করেছিল। ঐ ব্যক্তিও রসুলুল্লাহ্ (সা.)এর নিকট উপস্থিত হয়ে বলল, 'হে আল্লাহ্র নবী আমি আপনার কাছ থেকে পালিয়ে ইরানের দিকে গিয়েছিলাম। কিন্তু আমি চিন্তা করে দেখলাম যে, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর নবীর মাধ্যমে আমাদের শিরকে ধারণা দূর করে দিয়েছেন এবং আমাদের আধ্যাত্মিক ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করেছেন। আমি অপর দেশের লোকদের যাওয়ার বদলে তাঁর কেন ফিরে যাই না এবং নিজের পাপের কথা স্বীকার করে কেন তাঁর কাছে ক্ষমা চাই না?' রসুলুল্লাহ্ (সা.) বললেন, 'খোদা যখন তোমার হৃদয়ে ইসলামের ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন, তখন আমি কেন তোমার অপরাধ ক্ষমা করব না? যাও, আমি তোমাকে ক্ষমা করলাম। ইসলাম তোমার পূর্বের সকল পাপ মুছে ফেলেছে।' (পৃ:৩১৩)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) প্রতি প্রকৃত ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন করার তৌফিক দিন যার পরিণামে আমরা তাঁর নির্দেশিত শিক্ষাকে পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে মেনে চলতে পারি এবং তাঁর নির্দেশিত পথ থেকে বিচ্যুত না হই। আমীন। ওয়া আখিরু দাওয়ানা আনিল হামদু লিল্লাহি রাব্বিল আলামীন।

তাঁর মুখ দিয়ে এই বাক্য নিঃসৃত হয়েছিল-

لَعَنَ اللهُ الْيَهُوْدَ والنَّصَارَى
اتَّخَذُوا قُبُورَ أَنْبِيَاءِهِمْ مَسْجِدًا

আল্লাহ্ তা'লা ইহুদী ও নাসারাদের উপর অভিসম্পাত করুক, কেননা তারা নিজেদের আম্বিয়াগণের সমাধিগুলিকে সিজদাস্থলে পরিণত করেছে। (বুখারী) আর তিনি নিজের জন্য এই দোয়া করেন-

اَللّٰهُمَّ لَا تَجْعَلْ قَبْرِى وَثَنًا يُعْبَدُ

হে আল্লাহ্! তুমি আমার সমাধিকে পৌত্তলিকতার স্থানে পরিণত করো না।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) আঁ হযরত (সা.)-এর প্রকৃত অনুসরণের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লার ভালবাসা অর্জন সম্পর্কে বলেন-

"আমার ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা হচ্ছে, আঁ হযরত (সা.)-এর প্রতি আন্তরিক আনুগত্য ও ভালবাসা মানুষকে অবশেষে খোদা তা'লার প্রিয় বান্দায় পরিণত করে। তখন, খোদা সেই মানব-হৃদয়ে আপন প্রেমের এক আগুন উদ্দীপ্ত করে দেন। এবং সেই মানুষ অন্য সমস্ত কিছু থেকে তার হৃদয়কে মুক্ত করে নিয়ে খোদা তা'লার প্রতি ঝুঁকে পড়ে। তখন তার প্রেম-ভালবাসা, তার ইচ্ছা-অভিলাষ সব কিছুই একমাত্র খোদা তা'লার জন্য হয়ে যায়। তখন ঐশী ভালবাসার এক বিশেষ বিচ্ছুরণ তার উপরে পতিত হয়। এবং তাকে পূর্ণাঙ্গ ভালবাসার রঙে রঙীন করে প্রবল শক্তিতে নিজের দিকে আকর্ষণ করে। তখন সে তার প্রবৃত্তির তাড়নার উপর জয়লাভ করে। তখন তার সমর্থনে ও সাহায্যে সব দিক থেকেই খোদা তা'লার অসাধারণ কার্যাবলী নিদর্শনের আকারে প্রকাশিত হতে থাকে।'

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ৬৭)

আল্লাহ্ তা'লা আমাদের সকলকে আল্লাহ্ তা'লার একত্ব সম্পকে আঁ হযরত (সা.)-এর মহান শিক্ষাকে কায়োমনোবাক্যে শিরোধার্য করার তৌফিক দান করুন। আমীন।

****

ইমামের বাণী

" প্রকৃত ঈমান সেটিই যা হৃদয়ের গভীরে প্রবেশ করে এবং তার কর্মপন্থাকে নিজের রঙে রঙীন করে তোলে"

(মালফুযাত, ৪র্থ খণ্ড, পৃ: ৫৯৪)

দোয়াপ্রার্থী: Abdus Salam, Nararvita (Assam)

মহানবী (সা.)-এর বাণী

আল্লাহ্ তা'লার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি জীবনে এগুলিকে দৃষ্টিপটে রাখবে এবং এর বিকাশস্থল হওয়ার চেষ্টা করবে, সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। (তিরমিযি, কিতাবুদ দাওয়াত)

দোয়াপ্রার্থী: Qazi Badruddin, Neogir hat, (South 24 PGS)

হুযুরের ভাষণের শেষাংশ ৮ পৃ-র পর.....

করা হচ্ছে। অতএব, আজকে হযরত মসীহ্ মওউদই (আ.) একমাত্র সেই ব্যক্তিত্ব যিনি সকল দৃষ্টিকোণ থেকে ইসলাম এবং রসূলুল্লাহ (সা.)-এর মর্যাদার হেফাযত করেছেন এবং তাঁর মহিমাকে সমুন্নত করেছেন। এটিই তাঁর প্রেরিত হওয়ার উদ্দেশ্য ছিল যার বিরুদ্ধে আলেমদের সব সময় আপত্তি থাকে।

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ্ (সা.) জীবিত নবী, এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন-

"একটু চিন্তা করে দেখ এরা যখন কুরআন এবং সুন্নতের বিরুদ্ধে গিয়ে বলে থাকে যে, ঈসা (আ.) জীবিত আকাশে বসে আছেন, এর মাধ্যমে পাদ্রীরা আক্রমণের সুযোগ পায় আর তারা তড়িঘড়ি বলে বসে তোমাদের নবী মারা গেছে আর মাটিতেই কবরস্থ রয়েছে।" (বিভিন্ন টেলিভিশন চ্যানেলে এমনটিই হয়েছে, যে কারণে আরবদের মাঝে অনেক অস্থিরতা দেখা দিয়েছে। অবেশেষে এরা যখন আমাদের যুক্তি প্রমাণ শুনে, 'হেওয়ারে' অনুষ্ঠান শুনে, এম.টি.এ আরাবীর অনুষ্ঠানমালা তাদের অনেকেরই পছন্দ হয়েছে আর এই যুক্তিকে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখেছে। কিন্তু আলেমরা এখনও মানতে প্রস্তুত নয়) তিনি বলেন- "হযরত ঈসা (আ.) জীবিত এবং অপার্থিব। একই সাথে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অসম্মান করে বলে যে, তিনি মৃত।" তাদের এই কথা মিথ্যা যে, তোমাদের পয়গম্বর মারা গেছেন। মাআযাল্লাহ্॥ তিনি মাটিতেই পড়ে আছেন বা কবরস্থ আছেন। খ্রিষ্টান পাদ্রীরা বলে যে ঈসা (আ.) জীবিত আর তিনি আকাশে আছেন। একই সাথে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)এর অসম্মান করে খ্রিষ্টানরা বলে তিনি মৃত। এই অপপ্রচারই তারা করে আসছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন- "চিন্তা করে বল যে এই রসূল যিনি শ্রেষ্ঠ রসূল, যিনি খাতামুল আম্বিয়া এমন বিশ্বাস পোষণ করে তাঁর শ্রেষ্ঠত্ব এবং খাতামিয়াতকে কি এরা কালিমালিপ্ত করে না? অবশ্যই কলুষিত করে আর তারা নিজেরাই মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর অবমাননা করে। তিনি (আ.) বলেন: আমি বিশ্বাস রাখি যে, পাদ্রীদের দ্বারা এরা ইসলামকে যতটা খাটো করেছে (ইসলামের যত অবমাননা করিয়েছে মুসলমানরা, এই বিশ্বাস পোষণ করে যে, ঈসা (আ.) জীবিত) আর রসূলুল্লাহকে মৃত আখ্যায়িত করেছে, এর শাস্তি স্বরূপ তারা এই অশুভ পরিণতি এবং শাস্তি ভোগ করছে। এক দিকে তারা মৌখিক দাবি করে যে, তিনি (সা.) সব নবীদের মাঝে শ্রেষ্ঠ অপর দিকে এই স্বীকারোক্তিও দেয় যে, তিনি ৬৩ বছর বয়সে মারা গেছেন আর ঈসা (আ.) এখনও জীবিত, তিনি মারা যান নি। অথচ আল্লাহ্ তা'লা রসূলে করীম (সা.)কে সম্বোধন করে বলেন যে- وَكَانَ فَضْلُ اللّٰهِ عَلَيْكَ عَظِيْمًا (অর্থাৎ তোমার প্রতি খোদার অনেক বড় কৃপা।) প্রশ্ন হল খোদার এই উক্তি কী ভুল। না, মোটেই নয়, খোদার উক্তি শতভাগ সঠিক এবং সত্য। তারা মিথ্যাবাদী যারা বলে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.) মৃত। এর চেয়ে বড় কোন অবমাননাকর উক্তি হতেই পারে না। বস্তুতঃ, মুহাম্মদ (সা.) এর মাঝে এমন সব শ্রেষ্ঠত্ব রয়েছে যা অন্য কোন নবীর মাঝে নেই। এই কথা বলা আমার কাছে খুবই প্রিয় যে, যে ব্যক্তি রসূলুল্লাহ (সা.)এর জীবিত থাকার বিষয়টি বর্ণনা করে না, আমার মতে সে কাফের। কতই না পরিতাপের বিষয়! যে ব্যক্তির উম্মত হিসেবে পরিচয় দেয় তাঁকেই মৃত আখ্যা দেয়। আর ضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ- এর মাধ্যমে যে নবীর উম্মতের অবসান হয়েছে (অর্থাৎ লাঞ্ছনা ও দারিদ্রের কষাঘাতে তাদের জর্জরিত করা হয়েছে) সেই উম্মতকে জীবিত আখ্যা দেওয়া হয় বা সেই রসূলকে জীবিত আখ্যা দেওয়া হয়।"

(মালফুযাত, ৫ম খণ্ড,পৃষ্ঠা: ২৮-২৯)

মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর পূর্বে যে সকল নবী এসেছেন তারা এখন আর আসতে পারে না। ঈসা (আ.)ও আসতে পারেন না। কেননা তিনি মূসা (আ.) এর উম্মতের নবী ছিলেন। তিনি ইন্তেকাল করেছেন আর তাঁর উম্মতের এখন আর কেউ আসতে পারে না, মূসার উম্মতের এখন কেউ আসতে পারে না। এ বিষয়টি বর্ণনা করতে গিয়ে তিনি বলেন, এই কল্যাণরাজী মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর মাধ্যমে, তাঁর আনুগত্যের মাধ্যমে এখন জারি হতে পারে এবং হয়েছে। কেননা তিনি জীবন্ত নবী অর্থাৎ রসূলুল্লাহ (সা.) জীবন্ত নবী।

এই যুগে মহানবী (সা.)-এর আনুগত্যের কল্যাণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে প্রতিশ্রুত মসীহ্ এবং মাহদী হিসেবে পাঠিয়েছেন আর তিনি রসূলে করীম (সা.) এর অনুগত নবী এবং শরীয়ত বিহীন নবী। এই সম্পর্কে মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

"অতএব, আমি কেবল খোদার ফযলে, না আমার কোন গুণের দরুন, এই পুরস্কারে পূর্ণ অংশ লাভ করেছি, যা আমার পূর্বে নবী, রসূল এবং খোদার সম্মানিত ব্যক্তিদের দেওয়া হয়েছিল । এই নেয়ামত লাভ করা আমার জন্য সম্ভব ছিল না যদি আমি আমার নেতা ও মান্যবর, নবীদের গর্ব, সৃষ্টিকুলের সেরা হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর পদাঙ্ক অনুসরণ না করতাম। অতএব আমি যা কিছু পেয়েছি সেই অনুসরণের কল্যাণেই পেয়েছি। আমি আমার প্রকৃত এবং পূর্ণ জ্ঞানের ভিত্তিতে জানি, সেই নবী (সা.)-এর আজ্ঞানুবর্তিতা ছাড়া কোন মানুষ খোদা পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না, না পূর্ণ তত্ত্ব-জ্ঞান থেকে অংশ পেতে পারে না। আমি এখানে এই কথাও বলছি, সেটি কোন বিষয় যা মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সা.)-এর প্রকৃত এবং পূর্ণ আজ্ঞানুবর্তিতার পর সর্বপ্রথম হৃদয়ে সৃষ্টি হয়। অতএব, স্মরণ রাখা উচিত যে, তা হল এক সমর্পিত হৃদয়। অর্থাৎ সেই হৃদয় থেকে জাগতিক ভালোবাসা তিরোহিত হয়। হৃদয় এক অনন্ত এবং অক্ষয় আধ্যাত্মিক স্বাদের সন্ধানে থাকে। এরপর সমর্পিত হৃদয়ের দরুন এক স্বচ্ছ এবং পরিপূর্ণ ঐশী ভালবাসা অর্জিত হয়। এই সমস্ত পুরস্কার হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর আনুগত্যের কল্যাণে উত্তরাধিকার স্বরূপ লাভ হয়। যেভাবে আল্লাহ্ তা'লা নিজেই বলছেন: قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللّٰهُ অর্থাৎ তাদেরকে বলে দাও যে যদি তোমরা খোদাকে ভালোবেসে থাক তাহলে আস আমার অনুসরণ কর যেন খোদাও তোমাদের ভালোবাসতে পারেন বরং একতরফা ভালোবাসার দাবি একটি মিথ্যা কথা এবং গাল-গল্প। মানুষ যখন সত্যিকার অর্থে খোদাকে ভালোবাসে খোদা তা'লাও তাকে ভালোবাসেন। তখন পৃথিবীতে তার গ্রহণ যোগ্যতা বিস্তৃত করা হয়। সহস্র সহস্র মানুষের হৃদয়ে তাঁর এক সত্যিকার ভালোবাসার সঞ্চার করা হয়। তাকে এক আকর্ষণ করার শক্তি দান করা হয়। এক আলো তাকে একটি জ্যোতিঃ দান করা হয় যা তার চির সাথী হয়ে থাকে।" (দেখুন, বসবাসকারী আফ্রিকা দেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের মানুষের ভিতরও খোদা তা'লাই ভালোবাসা সঞ্চার করছেন, লক্ষ লক্ষ মানুষ আহমদীয়াত গ্রহণ করছে, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এর জামাতভুক্ত হচ্ছে।)

তিনি (আ.) বলেন- " কোন ব্যক্তি সত্যিকার অর্থে যখন খোদাকে ভালোবাসে সারা পৃথিবীর উপর তাঁকে প্রাধান্য দেয় আর আল্লাহ্ ছাড়া অন্যদের কোন মহিমা ও প্রতাপ তার হৃদয়ে অবশিষ্ট থাকে না বরং সে সবাইকে এক মৃত কীটের চেয়েও হীন মনে করে, তখন অন্তর্যামী খোদা তা'লা এক প্রবল জ্যোতিঃ বিকাশের সাথে তার প্রতি অবতীর্ণ হন। যখন একটি স্বচ্ছ আয়নাকে এমনভাবে সূর্যের বিপরীতে রাখা হয় যে, ঐ সূর্যের প্রতিবিম্ব তার উপর পরিপূর্ণরূপে পতিত হয়, তখন রূপকভাবে বলা যেতে পারে যে, সেই সূর্য যা আকাশে বিরাজমান তা এই আয়নাতেও বিদ্যমান। অনুরূপভাবেই খোদা এইরূপ ব্যক্তির হৃদয়ে অবতরণ করেন এবং তার হৃদয়কে স্বীয় আরশে (অর্থাৎ গুণাবলীর পবিত্র অবস্থান) পরিণত করেন। এই উদ্দেশ্যেই মানুষকে সৃষ্টি করা হয়েছে।"

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃষ্ঠা: ৬৪-৬৫)

অতএব, হযরত মসীহ মওউদ (আ.) রসূলে করীম (সা.) এর পূর্ণ প্রেমিক এবং তাঁর পূর্ণ অনুবর্তিতাকারী ছিলেন সেই কারণে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর প্রতি ভালোবাসা প্রদর্শন করেছেন এবং প্রতিশ্রুত মসীহ ও মাহদী এবং অনুসারী নবীর মর্যাদা তাঁকে দিয়েছেন।

আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে মানার পর আমাদেরকে এর যথাযোগ্য মূল্যায়ন করার তৌফিক দান করুন আর আমাদেরকেও মহানবী (সা.)-এর পূর্ণ অনবর্তিতাকারীর মর্যাদা দিন। প্রত্যেক ব্যক্তিকে নিজের সামর্থ্য এবং যোগ্যতা অনুসারে মুহাম্মদ রসূলুল্লাহর উত্তম আদর্শ অনুসরণের তৌফিক এবং সামর্থ্য দান করুন। আর মুসলমানদেরকেও তৌফিক দিন তারা রসূলে করীম (সা.)-এর এই সত্যিকার প্রেমাস্পদকে চিনতে পারে এবং তাঁর মান্যকারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পারে।

সৌজন্যে: আলফযল ইন্টারন্যাশনাল, ১৩ই আগস্ট, ২০১৯)

** *|*****|*****|* ***

মহানবী (সা.)-এর বাণী

সমস্ত কর্মের পরিণাম নির্ভর করে নিয়ত বা সংকল্পের উপর। প্রত্যেক মানুষ এই নিয়ত বা সংকল্প অনুযায়ীই প্রতিদান পেয়ে থাকে।

(বুখারী, কিতাবুল ঈমান ওয়াননুযুর)

দোয়াপ্রার্থী: Saeen Mir and Family, Kogram, Nalhati (Birbhum)

১ম পাতার শেষাংশ...

অভিযোগের উত্তর।

আঁ হযরত (সা.) যদি ইংরেজ সরকারের শাসন ব্যবস্থায় থাকতেন, তবে সরকার তাঁর প্রতি কিরূপ আচরণ করতেন আর হযরত আয়েশা (রা.) বিবাহ ৯ বছর বয়সে হয়েছিল- পাদ্রী ফতেহ মসীহ্‌র এই অভিযোগ ও প্রশ্নের উত্তর হযরত মসীহ মওউদ (আ.)এর ভাষায় উপস্থাপন করা হচ্ছে। তিনি বলেন-

"আপনি যে হযরত আয়েশা (রা.)এর উল্লেখ করে নয় বছর বয়সে বিয়ের প্রসঙ্গ তুলেছেন, এখানে প্রথমত নয় বছরের উল্লেখ আঁ হযরত (সা.)-এর মুখ থেকে প্রমাণিত নয়, এ বিষয়ে কোনও ওহীও নাযেল হয় নি, কিম্বা তাঁর বয়স যে নয় বছরই ছিল তা বর্ণনাকারীদের নিরবিচ্ছিন্ন কোনও ধারার মাধ্যমেও প্রমাণিত হয় না। কেবল একজন মাত্র বর্ণনাকারীর পক্ষ থেকে এটি উদ্ধৃত হয়েছে। আরবের মানুষ পঞ্জিকা ব্যবহার করত না, কেননা তারা নিরক্ষর ছিল। আরবের অবস্থার নিরিখে দুই-তিন বছরের তারতম্য নিতান্ত সাধারণ বিষয়। যেমনটি আমাদের দেশেও অধিকাংশ অশিক্ষিত লোকেরা দুই-চার বছরের পার্থক্যকে ঠিকমত মনে রাখতে পারে না। এছাড়া যুক্তির খাতিরে যদি ধরেও নেওয়া হয় যে সত্যিই এক একটি দিন হিসেব করে জানা গেল যে বয়স নয় বছরই ছিল, তবু কোন বিবেকবান ব্যক্তি এ নিয়ে আপত্তি করবে না। কিন্তু নির্বোধদের কোনও ওষুধ নেই। আমি আপনাকে নিজের পুস্তিকায় প্রমাণ করে দেখাব যে বর্তমান যুগের চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা এ বিষয়ে ঐক্যমত যে নয় বছর বয়সেও মেয়েরা সাবালিকা হতে পারে, এমনকি সাত বছরের মেয়েরও সন্তান হতে পারে আর বহু সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে তাঁরা এটি প্রমাণ করেছেন আর এদেশেই আঠ বা নয় বছরের মেয়েরা সন্তান লাভ করেছে, যা শত সহস্র মানুষ প্রত্যক্ষ করেছে।"

(নুরুল কুরআন নং ২, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড,পৃ: ৩৭৭)

সরকারি নিয়মে বিয়ের বয়স ১৮ বছর- এই আপত্তির উত্তরে হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'আপনার জন্য মোটেই পরিতাপ নেই আর হওয়া উচিত নয়। কেননা আপনি কেবল ধর্মান্ধই নন, চরম পর্যায়ের নির্বোধও বটে। আপনি এ পর্যন্ত এতটুকুও জানেন না যে সরকারের আইন প্রণীত হয় জনসাধারণের আবেদন অনুসারে, তাদের প্রথা ও সমাজের ধারা ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে; এর মধ্যে দার্শনিক সুলভ গবেষণা থাকে না। আর আপনি বার বার ইংরেজ সরকারের বুলি আওড়াচ্ছেন- একথা সত্যি যে আমি ইংরেজ সরকারের কৃতঘ্ন, যতদিন জীবিত থাকব এর হিতৈষী হয়ে থাকব। তবু আমি এই সরকারকে ত্রুটি মুক্ত মনে করি না, আর এও বিশ্বাস করি না যে এর আইন-কানুনগুলি প্রজ্ঞাপূর্ণ গবেষণার উপর ভিত্তি করে তৈরী হয়েছে। আমি মনে করি, সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগণের মতামতই হল আইন প্রণয়ণের মূল নীতি। সরকারের উপর ওহী অবতীর্ণ হয় না যে তারা আইন তৈরীর সময় কোন ভুল করবে না। আইন যদি এভাবে সুরক্ষিত থাকত, তবে সব সময় নতুন নতুন আইন কেন তৈরী হতে থাকে? ইংল্যান্ডে মেয়েদের সাবালিকা হওয়ার বয়স ১৮ বছর বলে মনে করা হয় আর গ্রীষ্মপ্রধান দেশগুলিতে মেয়েরা অনেক কম বয়সে সাবালিকা হয়ে ওঠে। আপনি যদি সরকারের আইনকে স্বর্গীয় ওহী বলে মনে করেন আর বিশ্বাস করেন যে এতে ভুল-ভ্রান্তির কোন সম্ভাবনা নেই, তবে ফিরতি ডাকে আমাকে সংবাদ দিন যাতে বাইবেল এবং সরকারি আইনের কিছুটা তুলনা করে আপনার কিছুটা সেবা করা যায়। বস্তুত সরকার এ পর্যন্ত এই মর্মে কোন ইশতেহার দেয় নি যে তাদের আইনও তওরাত ও বাইবেলের মত ত্রুটি মুক্ত। তবু যদি আপনি এই ধরণের কোন ইশতেহার পেয়ে থাকেন, তবে এর একটি অনুলিপি আমাকেও পাঠিয়ে দিবেন। কাজেই সরকারের আইন যদি খোদার কিতাবের ন্যায় ত্রুটি মুক্ত না হয়, তবুও সেগুলির কথা উল্লেখ করা হয় নির্বুদ্ধিতা কিম্বা ধর্মান্ধতার কারণে। কিন্তু আপনিও নিরুপায়।

(নুরুল কুরআন নং ২, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড,পৃ: ৩৭৮)

ইউরোপের চিকিৎসক মহল গবেষণা করে জানিয়েছে, ৯ বছরে, এমনকি সাত বছরের মেয়েরাও সাবালিকা হয়ে যায়।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

সরকারের যদি নিজের আইনের উপর আস্থা ছিল তবে সেই সব চিকিৎসা বিজ্ঞানীদের কেন শাস্তি দিল না সম্প্রতি যারা ইউরোপে গবেষণা করে জানিয়েছে যে মেয়েদের সাবালিকা হওয়ার বয়স নয় বছর, এমনকি সাত বছর পর্যন্তও হতে পারে। আর নয় বছর বয়স নিয়ে আপত্তি তুলেও বাইবেল বা তওরাত থেকে আপনি কোন প্রমাণ দিতে পারেন নি, শুধু সরকারি আইনের কথা উল্লেখ করেছেন। এর থেকে বোঝা যায় যে তওরাত ও বাইবেলের উপর আপনার আর ঈমান নেই, অন্যথায় নয় বছরে (বিবাহের) অবৈধতা আপনি তওরাত থেকে প্রমাণ করতেন, কিম্বা বাইবেল থেকে প্রমাণ করা উচিত ছিল। পাদ্রী সাহেব! ইলহামী গ্রন্থের ব্যাপারে সরকারি আইন পেশ করাটাই তো আপনার ধূর্ততা।

(নুরুল কুরআন নং ২, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড,পৃ: ৩৭৯)

আঁ হযরত (সা.) যদি বর্তমান যুগে হতেন, তবে ইংরেজ সরকার তাঁর প্রতি কিরূপ আচরণ করত- এই প্রশ্নের অভিযোগমূলক উত্তর।

হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

'আপনার মতে সরকারি আইনের সব বিষয় যদি ত্রুটিমুক্ত হয়ে থাকে এবং ইলহামি গ্রন্থের সমকক্ষ হয়, এমনকি তার চেয়ে শ্রেয় হয়, তবে আমি আপনাকে জিজ্ঞাসা করতে চাই যে, ১) ইংরেজ সরকার সেই সব নবীদের প্রতি কিরূপ আচরণ করত, যদি তারা এই যুগে থাকতেন, যারা এই সরকারের আইনের বিপরীতে লক্ষ লক্ষ দুগ্ধপোষ্য শিশুকে হত্যা করেছে? ২) যারা অপরের ক্ষেত থেকে শস্যের শিষ ছিঁড়ে খেয়েছিল, তাদেরকে এবং এই কাজের অনুমতি প্রদানকারীদেরকে যদি চালান করে আনা হত, ইংরেজ সরকার তাদেরকে কি কি শাস্তি দিত? ৩) আমি আরও জিজ্ঞাসা করতে চাই, যে ব্যক্তি ডুমুর ফল খেতে গিয়েছিল, বাইবেল থেকে প্রমাণিত যে ডুমুর গাছটি তাঁর নিজস্ব মালিকাধীন ছিল না, অন্য কোন ব্যক্তির ছিল, সেই ব্যক্তি যদি ইংরেজ সরকারের রাজত্বে এমন কাজ করত, সরকার তাকে কি শাস্তি দিত? ৪) বাইবেল থেকে এও প্রমাণ হয় যে, মসীহ বহু শূকর হত্যা করেছিলেন, যেগুলি অপরের সম্পদ ছিল, পাদ্রী ক্লার্ক সাহেবের মতে যার সংখ্যা ছিল দুই হাজার। এখন আপনিই বলুন, সরকারি দণ্ডবিধান অনুযায়ী এর শাস্তি কি?

আপাতত এতটুকু লেখাই যথেষ্ট। উত্তর অবশ্যই দিবেন, যাতে আরও কিছু প্রশ্ন করা যায়।

পাদ্রী ফতেহ মসীহকে এমন আপত্তি করা থেকে বিরত থাকার উপদেশ

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- পাদ্রী সাহেব! আপনার ধারণা একেবারেই অবান্তর যে, ৯ বছরের মেয়ের সঙ্গে সহবাস করা ব্যাভিচারের মধ্যে পড়ে। এই বিষয়টিকে বাইবেল দ্বারা প্রমাণ করার মধ্যেই আপনার সততা ছিল। বাইবেল আপনাকে ধাক্কা দিয়েছে, আর সেখানে না পেরে সরকারে চরণে ঠাঁই হয়েছে। স্মরণ রাখবেন, এই গালমন্দ কেবলই শয়তানি কুমন্ত্রণা। পবিত্র নবী (সা.) কে ব্যাভিচার ও দুরাচারের অপবাদ দেওয়া শয়তানের মিথ্যারোপ। এই দুই নবী,অর্থাৎ- আঁ হযরত (সা.) এবং হযরত মসীহ (আ.) -এর উপর কিছু বদজাত ও নোংরা প্রবৃত্তির মানুষ ঘোর মিথ্যারোপ করেছে। এই অপবিত্ররা, তাদের উপর আল্লাহ্ তা'লার অভিসম্পাত, প্রথমত নবী (সা.)কে ব্যাভিচারী আখ্যায়িত করেছে, যেমনটি আপনি করেছেন, এবং অন্যদেরকে জারজ সন্তান বলেছে, যেমনটি করেছে নোংরা প্রবৃত্তির ইহুদীরা। আপনার উচিত এমন আপত্তি করা থেকে বিরত থাকা।

(নুরুল কুরআন নং ২, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড,পৃ: ৩৮০)

আঁ হযরত (সা.) যদি এই যুগে হতেন, তবে ইংরেজ সরকার তাঁর প্রতি কিরূপ আচরণ করত? এমন ধৃষ্টতামূলক প্রশ্নের প্রকৃত উত্তর।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)বলেন-

পাদ্রী সাহেব প্রশ্ন করেছেন যে ইংরেজ সরকারের যুগে যদি এমন কোন ব্যক্তি থাকত যেমনটি আঁ হযরত (সা.) ছিলেন, সেক্ষেত্রে সরকার তার প্রতি কিরূপ আচরণ করত? আপনার নিকট স্পষ্ট থাকে যে যদি সেই সৈয়্যদুল কোনায়েন এই সরকারের যুগে হতেন, তবে এই সৌভাগ্যবান সরকার তাঁর তুচ্ছ সেবক হওয়াকে গর্বের বলে মনে করত। যেমনটি রোম সম্রাট কেবল ছবি দেখে উঠে দাঁড়িয়েছিল। এই সরকার সম্পর্কে এমন মন্দ ধারণা পোষণ করা আপনার দুর্ভাগ্য ও অপরিণামদর্শিতাকেই প্রকট করে, মনে হয় যেন সরকার খোদার পবিত্র বান্দাদের শত্রু। এই সরকার বর্তমান যুগে তুচ্ছ তুচ্ছ মুসলমান নেতাদের সম্মান করে। নাসরুল্লাহ্ খানকে দেখ, সে আঁ হযরত (সা.)-এর দাস হওয়ার মর্যাদাও রাখে না,

তাকে আমাদের ভারত সরকার কতটা সম্মান দিয়েছে। কাজেই সেই মহাসম্মানীয় পবিত্র সত্তা, যিনি এই পৃথিবীতেও এমন মর্যাদা রাখতেন যে বাদশাহগণ তাঁর চরণে লুটিয়ে পড়ত, তিনি যদি বর্তমান যুগে হতেন, তবে নিঃসন্দেহে এই সরকার তাঁর প্রতি সেবকসুলভ এবং আতিথেয়তাসুলভ আচরণ করত। খোদার রাজত্বের সামনে জাগতিক সাম্রাজ্যকে আত্মসমর্পণ করতেই হয়েছে। একথা কি আপনারা অজানা যে, আঁ হযরত (সা.)-এর যুগে রোম সম্রাট একজন খৃষ্টান বাদশাহ ছিল, যে কি না এই সরকারের থেকে জনপ্রিয়তায় কোন অংশে কম ছিল না, সে বলেছিল, 'সেই মহিয়ান নবীর সাহচর্যে থাকার সৌভাগ্য যদি আমার হত, তবে আমি তাঁর পা ধুয়ে দিতাম। অতএব, রোম সম্রাট যে কথা বলেছিল, নিঃসন্দেহে এই সৌভাগ্যবান সরকারও সে কথাই বলত, এর থেকে বেশিই বলত।

একহাজার টাকার পুরস্কার দেওয়ার চ্যালেঞ্জ।

যদি আপনি প্রমাণ করতে পারেন যে হযরত মসীহ (আ.) সম্পর্কে সমসাময়িক যুগের কোন ছোট জমিদারও এমন কথা বলেছে, যা রোমান সম্রাট আঁ হযরত (সা.) সম্পর্কে বলেছিল যা এ যাবৎ ইতিহাস ও সহীহ হাদীসে লিপিবদ্ধ আছে, তবে আমি আপনাকে এখনই এক হাজার টাকা নগদ পুরস্কার দিব। আর আপনি যদি এই প্রমাণ না দিতে পারেন, তবে এমন লাঞ্ছনাদায়ক জীবন থেকে আপনার জন্য মৃত্যুবরণ করা শ্রেয়। কেননা, আমি প্রমাণ করে দিয়েছি, রোমান সম্রাট এই সরকারের সমকক্ষ ছিল। ইতিহাস থেকে জানা যায় যে সমসাময়িক যুগে তার সৈন্য শক্তির সমকক্ষ কোন সাম্রাজ্য পৃথিবীতে ছিল না। আমাদের সরকার অবশ্য সেই মর্যাদায় পৌঁছয় নি। কাজেই রোমান সম্রাট এমন সাম্রাজ্যের অধিপতি হয়েও আক্ষেপের সুরে বলছে, 'আমি যদি সেই মহান ব্যক্তির কাছে পৌঁছতে পারতাম, তবে তাঁর পা ধুয়ে দিতাম-এই সরকার কি তার থেকে কম যেত। আমি দৃঢ় প্রত্যয়ের সাথে বলতে পারি, এই সরকারও অবশ্যই এমন সম্রাটের পায়ে লুটিয়ে পড়াকে গর্বের বলে মনে করে। কেননা, এই সরকার সেই স্বর্গীয় বাদশাহর অস্বীকারকারী নয়, যাঁর শক্তির সামনে মানুষ একটি মৃত কীটের তুল্যও নয়। তবে যদি এমন প্রশ্ন তোলা হয় যে, যদি এমন কোন ব্যক্তি এই সরকারের রাজত্বে নিজেকে খোদা কিম্বা খোদার পুত্র দাবি করে হইচই বাধায়, তবে সরকার এর কি বিহিত করত? এর উত্তর হল, এই দয়ালু সরকার তাকে কোন চিকিৎসকের হাতে তুলে দিত যাতে তার মাথা ঠিক হয়, কিম্বা লাহোর স্থিত সেই বিশাল ঘরটিতে বন্দী করে রাখত যেখানে এই ধরণের অনেক মানুষ একত্রিত করা আছে। "

(নুরুল কুরআন নং ২, রূহানী খাযায়েন, ৯ম খণ্ড,পৃ: ৩৮২)

হযরত মসীহ (আ.) এবং আঁ হযরত (সা.)-এর মাঝে পদমর্যাদার পার্থক্য স্পষ্ট।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন-

হযরত মসীহর (আ.) এবং হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সল্লম-এর প্রতি তাঁদের সমসাময়িক সরকারগুলো যে ব্যবহার করেছিল এবং এ ব্যাপারে তাঁদের জন্য যে ঐশী মর্যাদা ও যে ঐশী সাহায্যের প্রভাব প্রতিক্রিয়া প্রকাশিত হয়েছিল তার মধ্যে আমরা যখন তুলনা করি, তখন আমাদের স্বীকার করতেই হয় যে, হযরত খাতামুল আম্বিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র নবুয়্যতের মোকাবেলায় হযরত মসীহ (আ.)-এর খোদায়ী প্রদর্শন তো দূরের কথা, নবুয়্যতের মর্যাদা প্রদর্শনও প্রত্যক্ষ করা যায় না। হযরত নবী করীম (সা.) যখন সমসাময়িক সম্রাটগণের নামে পত্র প্রেরণ করেছিলেন তখন রোমান সম্রাট কায়সার দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলেছিলেন, আমি তো খৃষ্টানদের দ্বারা ঘেরাও অবস্থায় পড়ে আছি। আহা! আমি যদি এখান থেকে বের হওয়ার কোন সুযোগ পেতাম, এবং তাঁর (সা.)সমীপে উপস্থিত হতে পারতাম, তা হলে, আমি গোলামের ন্যায় তাঁর পবিত্র পদযুগল ধৌত করাকেই গৌরবের কাজ মনে করতাম। তবে, এক দুষ্ট চরিত্র ও নাপাক-হৃদয় বাদশাহ, ইরানের খসরু, পত্র পেয়ে ক্রোধান্বিত হয়ে উঠল এবং আঁ হযরত (সা.) কে গেফতার করে নিয়ে যাওয়ার জন্য সৈন্য প্রেরণ করল। তারা সন্ধ্যার প্রাক্কালে এসে পৌঁছল এবং বলল, আমাদের প্রতি হুকুম হল, গ্রেফতার করার। তাদের এসব বেহুদা কথায় কান না দিয়ে আঁ হযরত (সা.) বললেন, 'ইসলাম কবুল করো'। ঐ সময়ে তিনি (সা.) দু'চার জন সাহাবী সহ মসজিদে বসে ছিলেন। কিন্তু, তাঁর (সা.) কথার ঐশী প্রভাবে সৈন্যরা কাঁপতে শুরু করলো। যাইহোক, অবশেষে তারা বলল, আমাদের খোদাওন্দ-এর হুকুম, অর্থাৎ গ্রেপ্তারী পরওয়ানা সম্পর্কে আপনার কি জবাব? আমরা আপনার সেই জবাব নিয়েই ফিরে যাব। আঁ হযরত (সা.) বললেন, আগামীকাল জবাব পাবে। সকালে যখন তারা আবার হাজির হলো, তখন আঁ হযরত (সা.) বললেন, তোমরা যাকে খোদাওন্দ খোদাওন্দ বলছো সে তো খোদাওন্দ নয়। খোদাওন্দ হচ্ছেন তিনিই যাঁকে মৃত্যু ও জরা স্পর্শ করে না। কিন্তু তোমাদের খোদাওন্দ আজ রাতে মারা গেছে। আমার সত্য খোদাওন্দ তার বিরুদ্ধে তার পুত্রকে নিযুক্ত করেছিলেন। এবং আজ রাতেই সে তার পুত্রের হাতে নিহত হয়েছে। এবং এটাই হচ্ছে জবাব। এ ছিল এক বিরাট মোজেজা, অলৌকিক নিদর্শন। এবং এই নিদর্শন দেখে সে দেশের হাজার হাজার লোক ঈমান এনেছিল। কেননা, বাস্তবিকই ঐ রাতে খসরু পারভেজ অর্থাৎ কিসরা নিহত হয়েছিল। মনে রাখা দরকার, এই কথা ইঞ্জিলের কোন অস্পষ্ট ও ভিত্তিহীন কথার মত নয়। বরং, সহীহ্ হাদীস, ঐতিহাসিক প্রমাণ, এমনকি বিরুদ্ধবাদীদের সাক্ষ্য-স্বীকৃতি দ্বারাও প্রমাণিত। মি: ডেভনপোর্টও এই ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন তাঁর পুস্তকে।

পক্ষান্তরে, সমসাময়িক বাদশাহদের সামনে হযরত মসীহ (আ.)-এর যে সম্মান ছিল, তাও সকলের জানা। সম্ভবত:, আজও অব্দি বাইবেলে সেই ঘটনার বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে যে, হেরোডাস পীলাতের আদালতে মসীহকে (আ.) আসামীরূপে চালান করেছিল। এবং তিনি কিছুদিন হাজতবাসও করেছিলেন। কিন্তু, তাঁর ঈশ্বরত্বের কোন নিদর্শন দেখাতে পারেন নি। এবং অন্য কোন বাদশাহও এমন কথা বলেন নি যে, তাঁর সেবা করতে পারলে এবং পা ধুয়ে দিতে পারলে নিজেকে গৌরবান্বিত মনে করতাম। বরং, পীলাত তাঁকে ইহুদীদের হাতে তুলে দিয়েছিলেন। কী! এটাই কি তাঁর খোদায়ী ছিল? কত বিশাল ও বিস্ময়কর পার্থক্য! উভয় ব্যক্তির ক্ষেত্রে একই ধরণের ঘটনা ঘটেছে। কিন্তু, পরিণতি উভয়ের ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ আলাদা প্রমাণিত হয়েছে। একজনের ক্ষেত্রে এক উদ্ধত ও অহংকারী সম্রাট শয়তানের প্ররোচনায় প্ররোচিত হয়ে পরিণামে আল্লাহ্‌র অভিশাপে গ্রেফতার হয়েছে এবং আপন পুত্রের হাতে লাঞ্ছনার সাথে নিহত হয়েছে। অপর জনের ক্ষেত্রে, যাঁকে তাঁর অনুসারীরা তাঁর আসল দাবীকে পরিত্যাগ করে অহেতুক বাড়াবাড়ি করে তাঁকে আকাশে তুলে রেখেছ, তিনি সত্যি সত্যিই গ্রেফতার হয়েছিলেন, চালানও হয়েছিলেন। এবং ভীত সন্ত্রস্ত অবস্থায় জালেম পুলিশের হাওয়ালায় এক শহর থেকে অন্য শহরে প্রেরিত হয়েছিলেন। '

(নুরুল কুরআন, নং২, পৃ: ৩৮৪)

রোমান সম্রাট আঁ হযরত (সা.) এ পা ধুয়ে দেওয়ার বাসনা ব্যক্ত করেছিলেন, সেই হাদীসটির বর্ণনা।

সৈয়্যদানা হযরত মসীহ মওউদ (আ.) বলেন- যদি প্রশ্ন কর, কোন পুস্তকে লেখা আছে যে, রোমান সম্রাট বলেছিলেন, 'নবী (সা.)-এর সমীপে পৌঁছতে পারলে আমি গোলামদের ন্যায় তাঁর পবিত্র পদযুগল ধৌত করাকেই গৌরবের কাজ মনে করতাম। এর উত্তরে আপনার জন্য কিতাবুল্লাহ্‌র পর সব থেকে সঠিক গ্রন্থ বুখারীর বর্ণনা লিপিবদ্ধ করছি, চোখ খুলে পড়ে নিন।

وَقَدْ كُنْتُ أَعْلَمُ أَنَّهُ خَارِجٌ وَلَمْ أَكُ أَظُنُّ أَنَّهُ مِنْكُمْ فَلَوْ أَنِّي أَعْلَمُ أَنِّي
أَخْلُصُ إِلَيْهِ لَتَجَشَّمْتُ لِقَاءَهُ وَلَوْ كُنْتُ عِنْدَهُ لَغَسَلْتُ عَنْ قَدَمَيْهِ

অর্থাৎ, শেষ যুগের নবী যে আসবেন তা আমার জানা ছিল। কিন্তু আমি জানতাম না যে তিনি তোমাদের (হে আরববাসী) মাঝেই জন্ম নিবেন। আমি যদি তাঁর কাছে পৌঁছতে পারতাম, তবে তাঁর দর্শন পাওয়ার অনেক চেষ্টা করতাম আর যদি তাঁর সমীপে উপস্থিত হতে পারতাম, আমি তাঁর পদযুগল ধুয়ে দিতাম। এখন আপনার যদি কোন আত্মসম্মান থেকে থাকে, তবে মসীহর সমসাময়িক যুগের কোন বাদশার পক্ষ থেকে তাঁর প্রতি এমন সম্মান প্রদর্শনের ঘটনা উপস্থাপন করুন আর আমার কাছ থেকে নগদ এক হাজার টাকা পুরস্কার নিয়ে যান। আর সেটি বাইবেল থেকেই দেখাতে হবে এমনটা জরুরী নয়। নোংরা আবর্জনার মধ্যে পড়ে থাকা কোনও পৃষ্ঠাও হলেও তা পেশ কর, আর যদি কোন বাদশাহ বা গভর্নরের কোন উক্তি দেখানো সম্ভব না হয়, তবে কোন ছোট খাট নবাবের উক্তিও উপস্থাপন কর। আর মনে রাখবেন, আপনি এমনটি কখনই করতে পারবেন না। কোন অভিযোগ তুলে নিজেই সেই অভিযোগে অভিযুক্ত হওয়ার শাস্তি জাহান্নামের শাস্তিভোগ থেকে কোন অংশে কম নয়। পাদ্রী সাহেব বেশ বাহবা কুড়িয়েছেন বটে!

(নুরুল কুরআন, নং২, পৃ: ৩৮৬)

আমরা আমাদের প্রিয় প্রভুকে চিরকাল উত্তম আদর্শের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রাখব।

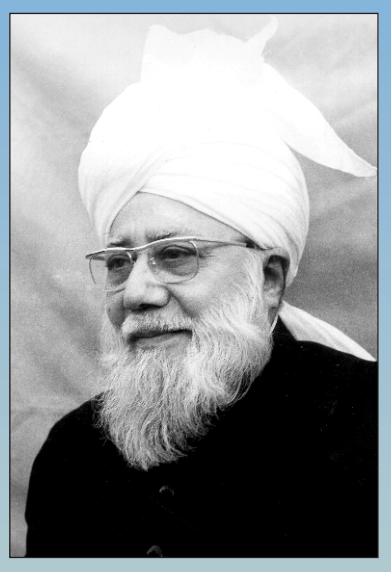

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালিস (রহ.) বলেন–

"আমরা নবী আকরম (সা.) কে নিজেদের পথপ্রদর্শক ও নেতা হিসেবে মেনেছি এবং পরম দয়ালু প্রভু ও প্রতিপালকের আদেশে, এবং তাঁর প্রীতি ও সন্তুষ্টি অর্জনের তরে এই অঙ্গীকার করেছি যে, আমরা আমাদের প্রিয় প্রভুকে চিরকাল উত্তম আদর্শের মর্যাদায় অধিষ্ঠিত রাখব; এবং নিজেদের প্রকৃতি ও জীবনকে সেই রঙে রঙীন করার চেষ্টা করতে থাকব, যে রঙ আল্লাহ্ তা'লা মুহাম্মদ রসুলুল্লাহ্ (সা.)–এর নির্মল প্রকৃতিতে সন্নিবিষ্ট রেখেছেন, আর সেটি ছিল ঐশী গুণাবলীর জ্যোতির সৌন্দর্যময় রঙ।

(খুতবাতে নাসের, ১ম খণ্ড, পৃ: ৫৮৮, প্রদত্ত ২৪ শে ফেব্রুয়ারী,

পৃথিবীর অন্য কোনও জ্যোতি তাঁর সামনে দেদীপ্যমান থাকার ক্ষমতা রাখে না।

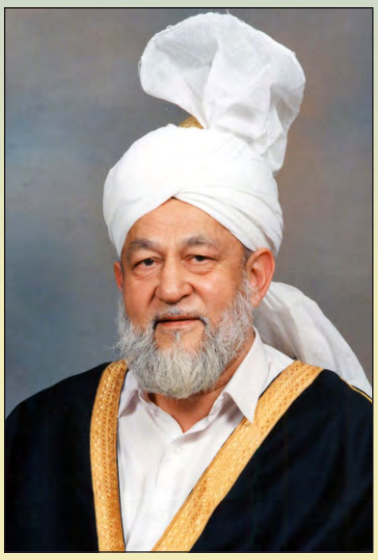

হযরত খলীফাতুল মসীহ রাবে (রহ.) বলেন:

"যেমন পার্থিব জগতে সূর্যের দৃষ্টান্ত রয়েছে, অনুরূপভাবে আধ্যাত্মিক জগতে রয়েছে হযরত আকদস মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)–এর সত্তা, যিনি খোদার জ্যোতির সেই আবরণ যার থেকে উজ্জ্বল আবরণ আমাদের এই পৃথিবীর মানুষ দেখে নি, দেখা সম্ভবও নয়। সেটি জ্যোতির এমন এক উজ্জ্বল আবরণ, যখন সেটি প্রকাশ পায়, তখন তার সামনে আলোর প্রত্যেকটি উৎস ঢাকা পড়ে যায়, না থাকে চাঁদের অস্তিত্ব, না দেখা যায় নক্ষত্ররাজির দ্যুতি ; পৃথিবীর অন্য কোনও জ্যোতি তাঁর সামনে দেদীপ্যমান থাকার ক্ষমতা রাখে না। ..... এই জ্যোতির দিকেই আমাদের সমগ্র জগতবাসীকে আহ্বান করতে হবে আর আমাদেরকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছে।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ১লা মার্চ, ১৯৬৬)

আন্তরিকতার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে এতবেশি দরুদ ছড়িয়ে দিন যাতে এর প্রতিটি কণা দরূদের সৌরভে সুরভিত হয়ে ওঠে।

হযরত খলীফাতুল মসীহ আল খামিস (আই.) বলেন–

"আমাদেরও কাজ হল নিজেদের দোয়াসমূহকে দরূদের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া এবং আন্তরিকতার সঙ্গে বায়ুমণ্ডলে এতবেশি দরুদ ছড়িয়ে দেওয়া যাতে এর প্রতিটি কণা দরূদের সৌরভে সুরভিত হয়ে ওঠে আর আমাদের সকল দোয়া সেই দরূদের মধ্য দিয়ে খোদা তা'লার কাছে পৌঁছে গ্রহণীয়তার মর্যাদা লাভ করে। আঁ হযরত (সা.) ও তাঁর বংশধরদের প্রতি এই পর্যায়ের ভালবাসা ও অনুরাগের বহিঃপ্রকাশই কাম্য।"

(খুতবা জুমা, প্রদত্ত, ২৪ শে ফেব্রুয়ারী, ২০০৬)

EDITOR
Tahir Ahmad Munir
Mobile: +91 9 679 481 821
E-mail : Banglabadar@hotmail.com
website:www.akhbarbadrqadian.in
www.alislam.org/badr

REGISTERED WITH THE REGISTRAR OF NEWSPAPERS OF INDIA AT NO PUNBEN/ 2016 / 70524

The Weekly **BADAR** *Qadian*

Qadian - 143516 Distt. Gurdaspur (Pb.) INDIA

Vol.6 Thursday 30 Sep- 7 Oct-2021 Issue. 39-40

MANAGER
SHAIKH MUJAHID AHMAD
Mobile : +91 99153 79255
e -mail:managerbadrqnd@gmail.com
SUBSCRIPTION
ANNUAL Rs.575/-

সৈয়্যদানা হযরত আকদস মসীহ মওউদ ও মাহদী আলাইহিস সালাম-এর বাণী

সকল নবী থেকে শ্রেষ্ঠ , পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা-'মুরুব্বীয়ে আজম'।

"বস্তুত তিনিই সকল নবী থেকে শ্রেষ্ঠ, তিনিই পৃথিবীর সর্বশ্রেষ্ঠ শিক্ষাদাতা-'মুরুব্বীয়ে আজম'। তাঁর (সা.) হাতেই পৃথিবীর সর্বগ্রাসী দুর্নীতিপরায়ণতা-'ফাসাদে আজম' দূরীভূত হয়েছে। তিনিই বিলুপ্ত হয়ে যাওয়া তৌহিদ পুনরুদ্ধার করেছেন এবং পুনরায় তা পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনিই সমস্ত বাতিল ধর্মকে দলীল-প্রমাণের দ্বারা পরাভূত করেছেন। তিনিই বিপথগামীদের সন্দেহ-সংশয় দূরীভূত করেছেন। তিনিই প্রত্যেক নাস্তিক ও সংশয়বাদীর অপচিন্তা বিদূরিত করেছেন। তিনিই পরিত্রাণের নীতি-দর্শন শিক্ষা দিয়েছেন। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ৯৭, টিকা নম্বর-৬)

অতি উচ্চ মর্যাদা ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী নবী

আঁ হযরত (সা.) ছিলেন এক অতি উচ্চ মর্যাদা ও পবিত্র হৃদয়ের অধিকারী। তিনি খোদার পথে প্রাণ দিতে সর্বদা প্রস্তুত ছিলেন, দুনিয়ার ভয় ও আশা থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলেন। তিনি খোদার উপরে সম্পূর্ণ নির্ভরশীল ছিলেন। তিনি খোদা তা'লার ইচ্ছা ও সন্তুষ্টির জন্য সম্পূর্ণ আত্মনিবেদিত ছিলেন। তিনি একথার কোন পরওয়া করতেন না যে, তৌহীদের প্রতি আহ্বান জানানোর জন্য কি কি বিপদ তাঁর মাথায় পড়তে পারে এবং মুশরেকরা কি কি দুঃখকষ্টে তাঁকে ফেলতে পারে। "

(বারাহীনে আহমদীয়া, ২য় ভাগ, রূহানী খাযায়েন, ১ম খণ্ড, পৃ: ১১১)

এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ', তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী!

আমি সর্বদা বিস্ময়ের সাথে লক্ষ্য করি যে,এই যে আরবী নবী যাঁর নাম 'মুহাম্মদ' (তাঁর প্রতি হাজার হাজার দরুদ ও সালাম), তিনি কতই না উচ্চ মর্যাদার নবী। তাঁর উচ্চ মর্যাদার সীমা অনুমান করা সম্ভব নয় এবং তাঁর পবিত্রকরণ শক্তির সঠিক অনুমান করা মানুষের কাজ নয়। পরিতাপের বিষয় এই যে, তাঁর মর্যাদা যেভাবে সনাক্ত করা উচিত ছিল, সেভাবে সনাক্ত করা হয় নি। যে তওহীদ দুনিয়া থেকে বিলুপ্ত হয়ে গিয়েছিল, তিনিই সেই বীরপুরুষ যিনি তা পুনরায় পৃথিবীতে ফিরিয়ে এনেছেন। তিনি খোদাকে শেষ সীমা পর্যন্ত ভালবেসেছেন এবং মানব জাতির প্রতি পরম সহানুভূতিতে হৃদয়কে বিগলিত করেছেন। এজন্যই তাঁর (সা.) হৃদয়ের রহস্য সম্পর্কে জ্ঞাত খোদা তাঁকে সমস্ত নবী ও সমস্ত 'আওওয়ালীন' (প্রথম) ও 'আখেরীন'দের (শেষের) উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন।

(হাকীকাতুল ওহী, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-২২, পৃ: ১১৮)

Printed & Published by: Jameel Ahmed Nasir on behalf of Nigran Board of Badar. Name of Owner: Nigran Board of Badar. And printed at Fazle-Umar Printing Press. Harchowal Road, Qadian, Distt. Gurdaspur-143516, Punjab. And published at office of Weekly Badar Mohallah - Ahmadiyya, Qadian Distt. Gsp-143516, Punjab. India. Editor: Tahir Ahmad Munir

প্রকাশনায়-জামিল আহমেদ নাসের ও মুদ্রণে ফজলে উমর প্রিন্টিং প্রেস, কাদিয়ান। প্রো:- তত্ত্বাবধায়ক, বদর বোর্ড কাদিয়ান

‘যখন আমরা ন্যায়ের দৃষ্টিতে দেখি, তখন আমরা নবুয়্যতের সারাটা শিক্ষাদিক্ষার মধ্যে মাত্র এমন একজনকেই দেখতে পাই যিনি সর্বোচ্চ মর্যাদার সাহসী নবী, জীবন্ত নবী এবং খোদা তা’লার অত্যুচ্চ মর্যাদার প্রিয় নবী, এবং যিনি নবীগণের নেতা, রসুলগণের গৌরব এবং সকল প্রেরিত পুরুষগণের মাথার মুকুট, এবং তাঁর নাম মুহাম্মদ মুস্তাফা আহমদ মুজতবা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম। তাঁর ছায়ার মধ্যে দশ দিন চলতে পারলেই সেই আলো লাভ করা যায়, যা ইতিপূর্বে হাজার বছরেও লাভ করা সম্ভব হত না।‘(সিরাজে মুনীর, রূহানী খাযায়েন, খণ্ড-১২, পৃ: ৮২)

খোদা তা’লা যাকে মহান বলে অভিহিত করেছেন তিনিই কতই না মহান!